আল আহ্যাব

৩৩

নামকরণ

এ সূরাটির নাম ২০ আয়াতের يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا বাক্যটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এক, আহযাব যুদ্ধ। এটি ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। দুই, বনী কুরাইযার যুদ্ধ। ৫ হিজরীর যিল্‌কাদ মাসে এটি সংঘটিত হয়। তিন, হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে। এটি অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের যিল্‌কাদ মাসে। এ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে সূরার নাযিল হওয়ার সময়–কাল যথাযথভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত ওহোদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়োজিত তীরন্দাজদের ভুলে মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো। এ কারণে আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদী ও মুনাফিকদের স্পর্ধা ও দুঃসাহস বেড়ে গিয়েছিল। তাদের মনে আশা জেগেছিল, তারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে সক্ষম হবে। ওহোদের পরে প্রথম বছরে যেসব ঘটনা ঘটে তা থেকেই তাদের এ ক্রমবর্ধমান স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য আন্দাজ করা যেতে পারে। ওহোদ যুদ্ধের পরে দু'মাসও অতিক্রান্ত হয়নি এমন সময় দেখা গেলো যে, নজ্‌দের বনী আসাদ গোত্র মদীনা তাইয়েবার ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু সালামার সারীয়া* বাহিনী পাঠাতে হলো। তারপর ৪ হিজরীর সফর মাসে আদাল ও কারাহ গোত্রদ্বয় তাদের এলাকায় গিয়ে লোকদেরকে দীন ইসলামের শিক্ষা দেবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়েকজন লোক চায়। নবী (সা) ছ'জন সাহাবীকে তাদের সংগে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রাজী' (জেদ্দা ও

* সীরাতের পরিভাষায় "সারীয়া" বলা হয় এমন সামরিক অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীক ছিলেন না। আর "গাযওয়া" বলা হয় এমন যুদ্ধ বা সমর অভিযানকে যাতে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সশরীরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

রাবেগের মাঝখানে) নামক স্থানে পৌঁছে তারা হুযাইল গোত্রের কাফেরদেরকে এ নিরস্ত্র ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্য থেকে চারজনকে তারা হত্যা করে এবং দু'জনকে (হযরত খুবাইব ইবনে আদী ও হযরত যায়েদ ইবনে দাসিন্নাহ) নিয়ে মক্কায় শত্রুদের হাতে বিক্রি করে দেয়। তারপর সেই সফর মাসেই আমের গোত্রের এক সরদারের আবেদনক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) আরো একটি প্রচারক দল পাঠান। এ দলে ছিলেন চল্লিশ জন (অথবা অন্য উক্তি মতে ৭০ জন) আনসারী যুবক। তাঁরা নজদের দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু তাঁদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। বনী সুলাইমের 'উসাইয়া, বি'ল ও যাক্ওয়ান গোত্রত্রয় বি'রে মা'উনাহ নামক স্থানে অকস্মাত তাঁদেরকে ঘেরাও করে সবাইকে হত্যা করে ফেলে। এ সময় মদীনার বনী নাযীর ইহুদী গোত্রটি সাহসী হয়ে ওঠে এবং একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে থাকে। এমনকি চার হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তারা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দেবার ষড়যন্ত্র করে। তারপর ৪ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে বনী গাত্ফানের দু'টি গোত্র বনু সা'লাবাহ ও বনু মাহারিব মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি চালায়। তাদের গতিরোধ করার জন্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়। এভাবে ওহোদ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও প্রতাপে যে ধস নামে, ক্রমাগত সাত আট মাস ধরে তার আত্মপ্রকাশ হতে থাকে।

কিন্তু শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচক্ষণতা এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন উৎসর্গের প্রেরণাই মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থার গতি পাল্টে দেয়। আরবদের অর্থনৈতিক বয়কট মদীনাবাসীদের জন্য জীবন ধারণ কঠিন করে দিয়েছিল। আশপাশের সকল মুশরিক গোত্র হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছিল। মদীনার মধ্যেই ইহুদী ও মুশরিকরা ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে উঠছিল। কিন্তু এ মুষ্টিমেয় সাচ্চা মু'মিনগোষ্ঠী আল্লাহর রসূলের নেতৃত্বে একের পর এক এমন সব পদক্ষেপ নেয় যার ফলে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি কেবল বহাল হয়ে যায়নি বরং আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়।

আহ্‌যাব যুদ্ধের পূর্বের যুদ্ধগুলো

এর মধ্যে ওহোদ যুদ্ধের পরগরই যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় সেগুলোই ছিল প্রাথমিক পদক্ষেপ। যুদ্ধের পরে ঠিক দ্বিতীয় দিনেই যখন বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছিল আহত, বহু গৃহে নিকটতম আত্মীয়দের শাহাদাত বরণে হাহাকার চলছিল এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আহত ছিলেন এবং তাঁর চাচা হাম্‌যার (রা) শাহাদাত বরণে ছিলেন শোক সন্তপ্ত, তখন তিনি ইসলামের উৎসর্গীত প্রাণ সেনানীদের ডেকে বলেন, আমাদের কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। কারণ মাঝ পথ থেকে ফিরে এসে তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। নবী করীমের (সা) এ অনুমান একদম সঠিক ছিল। কাফের কুরাইশরা তাদের হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া বিজয় থেকে লাভবান না হয়ে খালি হাতে চলে গেছে ঠিকই কিন্তু পথের মধ্যে কোথাও যখন তারা থেমে যাবে তখন নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জা অনুভব করবে এবং পুনর্বার মদীনা আক্রমণ করার জন্যে দৌড়ে আসবে। এ জন্য তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সংগে সংগেই ৬৩০ জন উৎসর্গীত প্রাণ সাথী তাঁর সংগে যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। মক্কার পথে

হাম্‌রাউল আসাদ নামক স্থানে পৌছে তিনি তিন দিন অবস্থান করেন। সেখানে একজন অমুসলিম শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে জানতে পারেন আবু সুফিয়ান তার ২৯৭৮ জন সহযোগীকে নিয়ে মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে দওরুর রওহা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। তারা যথার্থই নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে আবার ফিরে আসতে চাচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) একটি সেনাদল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছেন একথা শুনে তাদের সব সাহস উবে যায়। এ কার্যক্রমের ফলে কুরাইশরা আগে বেড়ে যে হিম্মত দেখাতে চাচ্ছিল তা ভেঙে পড়ে, এর ফায়দা স্রেফ এতটুকুই হয়নি বরং আশপাশের দুশমনরাও জানতে পারে যে, মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করছেন এক সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁর ইংগিতে মুসলমানরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরানের ভূমিকা এবং ১২২ টীকা)।

তারপর যখনই বনী আসাদ মদীনার ওপর নৈশ আক্রমণ করার প্রস্তুতি চালাতে থাকে, নবী করীম (স)-এর গোয়েন্দারা যথাসময়েই তাদের সংকল্পের খবর তাঁর কানে পৌছিয়ে দেয়। তাদের আক্রমণ করার আগেই তিনি হযরত আবু সালামার (উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার প্রথম স্বামী) নেতৃত্বে দেড়শো লোকের একটি বাহিনী তাদের মোকাবিলা করার জন্য পাঠান। এ সেনাদল হঠাৎ তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। অসচেতন অবস্থায় তারা নিজেদের সবকিছু ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ফলে তাদের সমস্ত সহায়-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এরপর আসে বনী নযীরের পালা। যেদিন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে এবং সে গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যায় সেদিনই তিনি তাদেরকে নোটিশ দিয়ে দেন, দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করো এবং এরপর তোমাদের যাকেই এখানে দেখা যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে অভয় দিয়ে বলে যে, অবিচল থাকো এবং মদীনা ত্যাগ করতে অস্বীকার করো, আমি দু'হাজার লোক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। বনী কুরাইযা তোমাদের সাহায্য করবে। নজ্‌দ থেকে বনী গাত্‌ফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। এসব কথায় সাহস পেয়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে পাঠায়, আমরা নিজেদের এলাকা ত্যাগ করবো না, আপনার যা করার করেন। নবী করীম (স) নোটিশের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেন, তাদের সহযোগীদের একজনেরও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার সাহস হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা এ শর্তে অস্ত্র সম্বরণ করে যে, তাদের প্রত্যেক তিন ব্যক্তি একটি উটের পিঠে যে পরিমাণ সম্ভব সহায়-সম্পদ বহন করে নিয়ে চলে যাবে এবং বাদবাকি সবকিছু মদীনায় রেখে যাবে। এভাবে মদীনার শহরতলীর সমস্ত মহল্লা যেখানে বনী নযীর থাকতো, তাদের সমস্ত বাগান, দুর্গ, পরিখা, সাজ-সরঞ্জাম সবকিছু মুসলমানদের হাতে চলে আসে। অন্যদিকে এ প্রতিশ্রুতি ভংগকারী গোত্রের লোকেরা খায়বার, আল কুরা উপত্যকা ও সিরিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করে।

তারপর তিনি বনী গাত্‌ফানের দিকে নজর দেন। তারা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছিল। তিনি চারশো সেনার একটি বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং যাতুর

রসূলুল্লাহ (সা)–এর সময়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের এলাকা
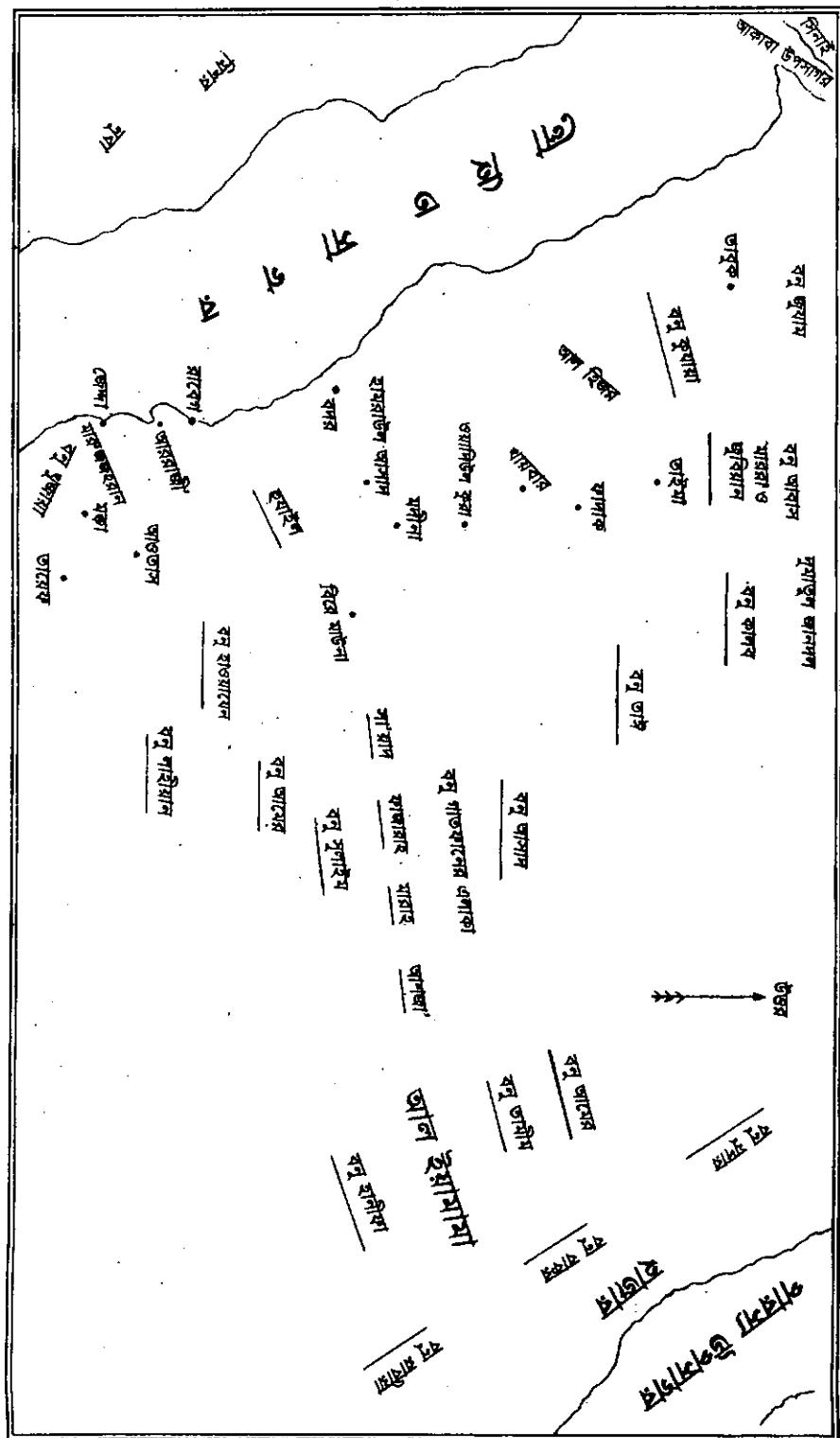
রিকা' নামক স্থানে গিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলেন। এ অতর্কিত হামলায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কোন যুদ্ধ ছাড়াই নিজেদের বাড়িঘর মাল–সামান সবকিছু ফেলে রেখে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এরপর ৪ হিজরীর শাবান মাসে তিনি আবু সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার জন্য বের হয়ে পড়েন। ওহোদ থেকে ফেরার সময় আবু সুফিয়ান এ চ্যালেঞ্জ দেয়। যুদ্ধ শেষে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের দিকে ফিরে ঘোষণা দিয়েছিল ঃ ان موعدكم بدر للعام المقبل (আগামী বছর বদরের ময়দানে আবার আমাদের ও তোমাদের মোকাবিলা হবে।) নবী করীম (সা) জবাবে একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দেন ঃ نعم ، هى بيننا وبينك موعد (ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হলো।) এ সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে তিনি দেড় হাজার সাহাবীদের নিয়ে বদরে উপস্থিত হন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দু'হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়। কিন্তু মার্‌রায্ যাহ্‌রান (বর্তমান ফাতিমা উপত্যকা) থেকে সামনে অগ্রসর হবার হিম্মত হয়নি। নবী করীম (সা) আট দিন পর্যন্ত বদরে অপেক্ষা করেন। এ অন্তরবর্তীকালে ব্যবসায় করে মুসলমানরা বেশ দু'পয়সা কামাতে থাকে। এ ঘটনার ফলে ওহোদে মুসলমানদের যে প্রভাবহানি ঘটে তা আগের চাইতেও আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এর ফলে সারা আরবদেশে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কুরাইশ গোত্র একা আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না। (এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ১২৪ টীকা)

আর একটি ঘটনা এ প্রভাব আরো বাড়িয়ে দেয়। আরব ও সিরিয়া সীমান্তে দূমাতুল জান্‌দাল (বর্তমান আল জওফ) ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেখান থেকে ইরাক এবং মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে আরবের বাণিজ্যিক কাফেলা যাওয়া আসা করতো। এ জায়গার লোকেরা কাফেলাগুলোকে বিপদগ্রস্ত এবং অধিকাংশ সময় লুণ্ঠন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার সৈন্য নিয়ে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নিজেই সেখানে যান। তারা তাঁর মোকাবিলা করার সাহস করেনি। লোকালয় ছেড়ে তারা পালিয়ে যায়। এর ফলে দক্ষিণ আরবের সমস্ত এলাকায় ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতি মনে করতে থাকে মদীনায় যে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির উন্মেষ ঘটেছে তার মোকাবিলা করা এখন আর একটি দু'টি গোত্রের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আহ্‌যাবের যুদ্ধ

এ অবস্থায় আহ্‌যাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ছিল আসলে মদীনার এ শক্তিটিকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আরবের বহুসংখ্যক গোত্রের একটি সম্মিলিত হামলা। এর উদ্যোগ গ্রহণ করে বনী নযীরের মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খয়বরে বসতি স্থাপনকারী নেতারা। তারা বিভিন্ন এলাকা সফর করে কুরাইশ, গাত্‌ফান, হুযাইল ও অন্যান্য বহু গোত্রকে একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

এভাবে তাদের প্রচেষ্টায় ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে আরবের বিভিন্ন গোত্রের এক বিরাট বিশাল সম্মিলিত বাহিনী এ ক্ষুদ্র জনপদ আক্রমণ করে। এতবড় বাহিনী আরবে ইতিপূর্বে আর কখনো একত্র হয়নি। এতে যোগ দেয় উত্তর থেকে বনী নযীর ও বনী কাইনুকার ইহুদিরা। এরা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খয়বর ও ওয়াদিউল কুরায় বসতি স্থাপন করেছিল। পূর্ব থেকে যোগ দেয় গাত্‌ফানের গোত্রগুলো (বনু সালীম, ফাযারাহ, মুর্‌রাহ, আশ্‌জা', সা'আদ ও আসাদ ইত্যাদি)। দক্ষিণ থেকে এগিয়ে আসে কুরাইশ তাদের বন্ধু গোত্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বিশাল বাহিনী সহকারে। এদের সবার সম্মিলিত সংখ্যা দশ বারো হাজারের কম হবে না।

এটা যদি অতর্কিত আক্রমণ হতো তাহলে তা হতো ভয়াবহ ধ্বংসকর। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় বসে ছিলেন না। বরং সংবাদদাতারা এবং সমস্ত গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী ও প্রভাবিত লোকেরা তাঁকে দুশমনদের চলাফেরা ও প্রত্যেকটি গতিবিধি সম্পর্কে সর্বক্ষণ খবরাখবর সরবরাহ করে আসছিলেন।* এ বিশাল বাহিনী তাঁর শহরে পৌঁছুবার আগেই ছ'দিনের মধ্যেই তিনি মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করে ফেলেন এবং সাল্‌'আ পর্বতকে পেছনে রেখে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে পরিখার আশ্রয়ে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ পরিচালনা করতে প্রস্তুত হন। মদীনার দক্ষিণে বাগান ও গাছপালার পরিমাণ ছিল এত বেশী (এবং এখনো আছে) যে, সেদিক থেকে কোন আক্রমণ চালানো সম্ভব ছিল না। পূর্বদিকে ছিল লাভার পর্বতমালা। তার ওপর সম্মিলিত সৈন্য পরিচালনা করা কোন সহজ কাজ ছিল না। পশ্চিম দক্ষিণকোণের অবস্থাও এ একই ধরনের ছিল। তাই আক্রমণ হতে পারতো একমাত্র ওহোদের পূর্ব ও পশ্চিম কোণগুলো থেকে। নবী করীম (সা) এদিকেই পরিখা খনন করে নগরীকে সংরক্ষিত করে নেন। আসলে মদীনার বাইরে পরিখার মুখোমুখি হতে হবে, এটা কাফেররা ভাবতেই পারেনি। তাদের যুদ্ধের নীল নক্‌শায় আদতে এ জিনিসটি ছিলই না। কারণ আরববাসীরা এ ধরনের প্রতিরক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই সেই শীতকালে তাদেরকে একটি দীর্ঘ স্থায়ী অবরোধের জন্য তৈরি হতে হয়। অথচ এ জন্য তারা গৃহ ত্যাগ করার সময় প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি।

এরপর কাফেরদের জন্য শুধুমাত্র একটা পথই খোলা ছিল। তারা ইহুদি গোত্র বনী কুরাইযাকে বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারতো। এ গোত্রটির বসতি ছিল মদীনার দক্ষিণ পূর্ব কোণে। যেহেতু এ গোত্রটির সাথে মুসলমানদের যথারীতি মৈত্রী চুক্তি ছিল এবং এ চুক্তি অনুযায়ী মদীনা আক্রান্ত হলে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হতে বাধ্য, তাই মুসলমানরা এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের পরিবার ও ছেলেমেয়েদেরকে বনী কুরাইযার সন্নিহিত এলাকায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেদিকে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা করেনি। কাফেররা মুসলমানদের প্রতিরক্ষার এ দুর্বল দিকটি আঁচ

* জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মোকাবিলায় একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের প্রাধান্যের এটি হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। জাতীয়তাবাদীরা শুধুমাত্র নিজেদের জাতির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল হয়। কিন্তু একটি আদর্শবাদী ও নীতিবাদী অন্দোলন নিজের দাওয়াতের মাধ্যমে সবদিকে এগিয়ে চলে এবং স্বয়ং ঐ জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকেও তার সমর্থক বের করে আনে।

খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা
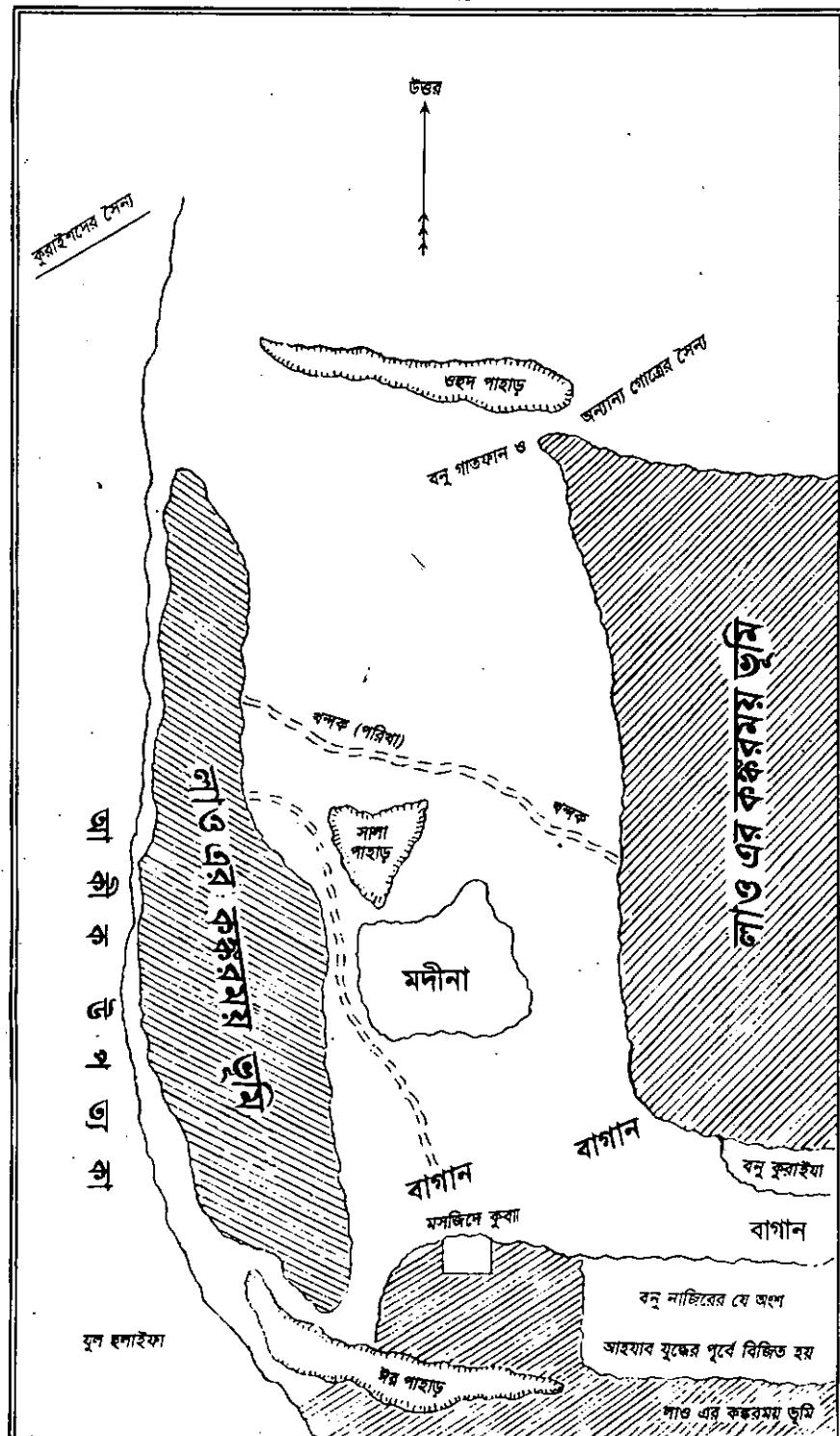
করতে পারে। তাদের পক্ষ থেকে বনী নযীরের ইহুদি সরদার হুয়াই ইবনে আখ্‌তাবকে বনী কুরাইযার কাছে পাঠানো হয়। বনী কুরাইযাকে চুক্তি ভংগ করে দ্রুত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করানোই ছিল তার কাজ। প্রথমদিকে তারা অস্বীকার করে এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ এবং আজ পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে এমন কোন ব্যবহার করেননি যার ফলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারি। কিন্তু যখন ইবনে আখ্‌তাব তাদেরকে বললো, "দেখো, আমি এখন সারা আরবের সম্মিলিত শক্তিকে এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছি। একে খতম করে দেবার এটি একটি অপূর্ব সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে এরপর আর কোন সুযোগ পাবে না" তখন ইহুদি জাতির চিরাচরিত ইসলাম বৈরী মানসিকতা নৈতিকতার মর্যাদা রক্ষার ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং বনী কুরাইযা চুক্তি ভংগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারেও বেখবর ছিলেন না। তিনি যথা সময়ে এ খবর পেয়ে যান। সংগে সংগেই তিনি আনসার সরদারদেরকে (সা'দ ইবনে উবাদাহ, সা'দ ইবনে মু'আয, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ও খাওয়াত ইবনে জুবাইর) ঘটনা তদন্ত করার এবং এ সংগে তাদের বুঝাবার জন্য পাঠান। যাবার সময় তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যদি বনী কুরাইযা চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে ফিরে এসে সমগ্র সেনাদলকে সুস্পষ্ট ভাষায় এ খবর জানিয়ে দেবে। কিন্তু যদি তারা চুক্তি ভংগ করতে বদ্ধ–পরিকর হয় তাহলে শুধুমাত্র আমাকে ইংগিতে এ খবরটি দেবে, যাতে এ খবর শুনে সাধারণ মুসলমানরা হিম্মতহারা হয়ে না পড়ে। এ সরদারগণ সেখানে পৌঁছে দেখেন বনি কুরাইযা তাদের নোংরা চক্রান্ত বাস্তবায়নে পুরোপুরি প্রস্তুত। তারা প্রকাশ্যে তাঁদেরকে জানিয়ে দেয় لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد "আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে কোন অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি নেই।" এ জবাব শুনে তারা মুসলিম সেনাদলের মধ্যে ফিরে আসেন এবং ইংগিতে রসূলে করীমকে (সা) জানান عضل وقاره অর্থাৎ 'আদল ও কারাহ ইসলাম প্রচারক দলের সাথে রাজী' নামক স্থানে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বনী কুরাইযা এখন তাই করছে।

এ খবরটি অতি দ্রুত মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্য ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ এখন তারা দু'দিক থেকেই ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের শহরের যে অংশে তারা কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়নি সে অংশটি বিপদের সম্মুখীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের সন্তান ও পরিবারের লোকেরা সে অংশেই ছিল। এর ফলে মুনাফিকদের তৎপরতা অনেক বেশী বেড়ে যায়। মু'মিনদের উৎসাহ–উদ্যম নিস্তেজ করে দেবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মনস্তাত্বিক হামলা শুরু করে দেয়। কেউ বলে, "আমাদের সাথে অংগীকার করা হয়েছিল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করা হবে কিন্তু এখন অবস্থা এমন যে আমরা পেশাব পায়খানা করার জন্যও বের হতে পারছি না।" কেউ একথা বলে খন্দক যুদ্ধের ময়দান থেকে ছুটি চাইতে থাকে যে, এখন তো আমাদের গৃহও বিপদাপন্ন, সেখানে গিয়ে সেগুলো রক্ষা করতে হবে। কেউ এমন ধরনের গোপন প্রচারণাও শুরু করে দেয় যে, আক্রমণকারীদের সাথে আপোষ রফা করে নাও এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের হাতে তুলে দাও। এটা এমন একটা

কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল যার মধ্যে পড়ে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মুখোস উন্মোচিত হয়ে গেছে যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও মুনাফিকী ছিল। একমাত্র সাচ্চা ও আন্তরিকতা সম্পন্ন ঈমানদাররাই এ কঠিন সময়েও আত্মোৎসর্গের সংকল্পের ওপর অটল থাকে।

এহেন নাজুক সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাত্ফানদের সাথে সন্ধির কথাবার্তা চালাতে থাকেন এবং তাদেরকে মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু যখন আনসার সরদার বৃন্দের (সা'দ ইবনে উবাদাহ ও সা'দ ইবনে মু'আয) সাথে তিনি চুক্তির এ শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁরা বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা এমনটি করবো এটা কি আপনার ইচ্ছা? অথবা এটা আল্লাহর হুকুম, যার ফলে আমাদের জন্য এটা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই? না কি নিছক আমাদেরকে বাঁচাবার একটি ব্যবস্থা হিসেবে আপনি এ প্রস্তাব দিচ্ছেন?" জবাবে তিনি বলেন, "আমি কেবল তোমাদের বাঁচাবার জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। কারণ আমি দেখছি সমগ্র আরব একজোট হয়ে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি তাদের এক দলকে অন্য দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাই।" একথায় উভয় সরদার এক কণ্ঠে বলেন, "যদি আপনি আমাদের জন্য এ চুক্তি করতে এগিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তা খতম করে দিন। যখন আমরা মুশরিক ছিলাম তখনও এ গোত্রগুলো আমাদের কাছ থেকে একটি শস্যদানাও কর হিসেবে আদায় করতে পারেনি, আর আজ তো আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার গৌরবের অধিকারী। এ অবস্থায় তারা কি এখন আমাদের থেকে কর উসূল করবে? আমাদের ও তাদের মাঝখানে এখন আছে শুধুমাত্র তলোয়ার যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা না করে দেন।" একথা বলে তাঁরা চুক্তিপত্রের খসড়াটি ছিঁড়ে ফেলে দেন, যার ওপর তখনো স্বাক্ষর করা হয়নি।

এ সময় গাত্ফান গোত্রের আশ্জা' শাখার না'ঈম ইবনে মাস'উদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তিনি বলেন, এখনো কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের খবর জানে না। আপনি আমাকে দিয়ে যে কোন কাজ করাতে চান আমি তা করতে প্রস্তুত। নবী করীম (সা) বলেন, তুমি গিয়ে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো।* একথায় তিনি প্রথমে যান বনী কুরাইযার কাছে। তাদের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল খুব বেশী। তাদেরকে গিয়ে বলেন, কুরাইশ ও গাতফান তো অবরোধে বিরক্ত হয়ে এক সময় ফিরে যেতেও পারে। এতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু তোমাদের তো মুসলমানদের সাথে এখানে বসবাস করতে হবে। তারা চলে গেলে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? আমার মতে তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধে অংশ নিয়ো না যতক্ষণ বাইর থেকে আগত গোত্রগুলোর মধ্য থেকে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোককে তোমাদের কাছে যিম্মী হিসেবে না রাখে। একথা বনী কুরাইযার মনে ধরলো। তারা গোত্রসমূহের সংযুক্ত ফ্রন্টের কাছে যিম্মী চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এরপর তিনি কুরাইশ ও গাত্ফানের সরদারদের কাছে যান। তাদেরকে বলেন, বনী কুরাইযা কিছুটা শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তারা তোমাদের কাছে যদি যিম্মী হিসেবে কিছু লোক চায় তাহলে

* এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন الحرب خدعة। অর্থাৎ যুদ্ধে প্রতারণা করা বৈধ।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই এবং তাদেরকে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতে সোপর্দ করে আপোষ রফা করে নিতে পারে। কাজেই তাদের সাথে সতকর্তার সাথে কাজ করা উচিত। এর ফলে সম্মিলিত জোটের নেতারা বনী কুরাইযার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তারা কুরাইযা নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠায় যে, দীর্ঘ অবরোধে আমাদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। এখন আমরা চাই একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। আগামীকাল তোমরা ওদিক থেকে আক্রমণ করো, আমরা একই সংগে এদিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালাবো। বনী কুরাইযা জবাবে বলে পাঠায়, আপনারা যতক্ষণ যিম্মী স্বরূপ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে আমাদের হাওয়ালা করে না দেন ততক্ষণ আমরা যুদ্ধের বিপদের সম্মুখীন হতে পারি না। এ জবাব শুনে সম্মিলিত জোটের নেতারা না'ঈমের কথা সঠিক ছিল বলে বিশ্বাস করে। তারা যিম্মী দিতে অস্বীকার করে। ফলে বনী কুরাইযা বিশ্বাস করে না'ঈম আমাদের সঠিক পরামর্শ দিয়েছিল। এভাবে এ যুদ্ধ কৌশল বড়ই সফল প্রমাণিত হয়। এর ফলে শত্রুশিবিরে ফাটল সৃষ্টি হয়।

এখন অবরোধ কাল ২৫ দিন থেকেও দীর্ঘ হতে চলছিল। শীতের মওসুম চলছিল। এত বড় সেনাদলের জন্য পানি, আহার্যদ্রব্য ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলছিল, অন্যদিকে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অবরোধকারীদের উৎসাহেও ভাটা পড়েছিল। এ অবস্থায় এক রাতে হঠাৎ ভয়াবহ ধূলিঝড় শুরু হয়। এ ঝড়ের মধ্যে ছিল শৈত্য, বজ্রপাত ও বিজলী চমক এবং অন্ধকার ছিল এত গভীর যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। প্রবল ঝড়ে শত্রুদের তাঁবুগুলো তছনছ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ভীষণ হৈ-হাংগামা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর কুদরাতের এ জবরদস্ত আঘাত তারা সহ্য করতে পারেনি। রাতের অন্ধকারেই প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহের পথ ধরে। সকালে মুসলমানরা জেগে উঠে ময়দানে একজন শত্রুকেও দেখতে পায়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ময়দান শত্রুশূন্য দেখে সংগে সংগেই বলেন ঃ

لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم

"এরপর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না এখন তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে।" এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ। কেবল কুরাইশ নয়, সমস্ত শত্রু গোত্রগুলো একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের শেষ অস্ত্র হেনেছিল। এতে হেরে যাওয়ার পরে এখন আর তাদের মদীনার ওপর আক্রমণ করার সাধ্য ছিল না। এখন আক্রমণাত্মক শক্তি (Offensive) শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

বনী কুরাইযার যুদ্ধ

খন্দক থেকে গৃহে ফিরে আসার পর যোহরের সময় জিব্রীল (আ) এসে হুকুম শুনালেন, এখনই অস্ত্র নামিয়ে ফেলবেন না। বনী কুরাইযার ব্যাপারটির এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। এ মুহূর্তেই তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া দরকার। এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ঘোষণা করে দিলেন, "যে ব্যক্তিই শ্রবণ ও আনুগত্যের ওপর অবিচল আছো সে

আসরের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত পড়ো না যতক্ষণ না বনী কুরাইযার আবাসস্থলে পৌঁছে যাও।" এ ঘোষণার সাথে সাথেই তিনি হযরত আলীকে (রা) একটি ক্ষুদ্র সেনাদলসহ অগ্রবর্তী সেনাদল হিসেবে বনী কুরাইযার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যখন সেখানে পৌছলেন তখন ইহুদিরা নিজেদের গৃহের ছাদে উঠে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গালি বর্ষণ করলো। কিন্তু একেবারে ঠিক যুদ্ধের সময়েই তারা চুক্তি ভংগ করে এবং আক্রমণকারীদের সাথে মিলে মদীনার সমগ্র জনবসতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে যে মহাঅপরাধ করেছিল তার দণ্ড থেকে এ গালাগালি তাদেরকে কেমন করে বাঁচাতে পারতো? হযরত আলীর ক্ষুদ্র সেনাদল দেখে তারা মনে করেছিল এরা এসেছে নিছক ভয় দেখানোর জন্য। কিন্তু যখন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে পুরা মুসলিম সেনাদল সেখানে পৌঁছে গেলো এবং তাদের জনবসতি ঘেরাও করে নেয়া হলো তখন তাদের হুশ হলো। দু'তিন সপ্তাহের বেশী তারা অবরোধের কঠোরতা বরদাশ্‌ত করতে পারলো না। অবশেষে তারা এ শর্তে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আত্মসমর্পণ করলো যে, আওস গোত্রের সরদার হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা) তাদের জন্য যা ফায়সালা করবেন উভয় পক্ষ তাই মেনে নেবে। তারা এ আশায় হযরত সা'দকে শালিস মেনেছিল যে, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আওস ও বনী কুরাইযার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে যে মিত্রতার সম্পর্ক চলে আসছিল তিনি সেদিকে নজর রাখবেন এবং তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেবেন যেমন ইতিপূর্বে বনী কাইনুকা' ও বনী নযিরকে দেয়া হয়েছিল। আওস গোত্রের লোকেরাও হযরত সা'দের কাছে নিজেদের মিত্রদের সাথে সদয় আচরণ করার দাবী করছিল। কিন্তু হযরত সা'দ মাত্র এই কিছুদিন আগেই দেখেছিলেন, দু'টি ইহুদি গোত্রকে মদীনা থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল এবং তারা কিভাবে আশপাশের সমস্ত গোত্রকে উত্তেজিত করে দশ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে এসেছিল। তারপর এ সর্বশেষ ইহুদি গোত্রটি একেবারে ঠিক বহিরাগত আক্রমণের সময়ই চুক্তিভংগ করে মদীনাবাসীদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবার কি ষড়যন্ত্রটাই না করেছিল সে ঘটনা এখনো তাঁর সামনে তরতাজা ছিল। তাই তিনি ফায়সালা দিলেন : বনী কুরাইযার সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদেরকে গোলামে পরিণত করা হোক এবং তাদের সমুদয় ধন-সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এ ফায়সালাটি বাস্তবায়িত করা হলো। এরপর মুসলমানরা প্রবেশ করলো বনী কুরাইযার পল্লীতে। সেখানে তারা দেখলো, আহযাব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য এ বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠীটি ১৫ শত তলোয়ার, ৩ শত বর্ম, ২ হাজার বর্শা এবং ১৫ শত ঢাল গুদামজাত করে রেখেছে। মুসলমানরা যদি আল্লাহর সাহায্য লাভ না করতো তাহলে এ সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র ঠিক এমন এক সময় পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্য ব্যবহৃত হতো যখন সামনে থেকে মুশরিকরা একজোটে খন্দক পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিতো। এ বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যাবার পর এখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশই থাকেনি যে, হযরত সা'দ ইহুদিদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছিলেন তা সঠিক ছিল।

সামাজিক সংস্কার

ওহোদ যুদ্ধ ও আহযাব যুদ্ধের মাঝখানের এ দু'টি বছর যদিও এমন সংকট ও গোলযোগে পরিপূর্ণ ছিল যার ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ একদিনের জন্যও নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারেননি, তারপরও এ সমগ্র সময়–কালে নতুন মুসলিম সমাজ গঠন এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ অব্যাহতভাবে চলছিল। এ সময়েই মুসলমানদের বিয়ে ও তালাকের আইন প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছিল। উত্তরাধিকার আইন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়েছিল। অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য বহু দিকে নতুন বিধি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

এ প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনযোগ্য বিষয় ছিল দত্তক গ্রহণ। আরবের লোকেরা যে শিশুটিকে দত্তক বা পালিত পুত্র বা কন্যা হিসেবে গ্রহণ করতো তাকে একেবারে তাদের নিজেদের গর্ভজাত সন্তানের মতো মনে করতো। সে উত্তরাধিকার লাভ করতো। তার সাথে দত্তক মাতা ও বোনেরা ঠিক তেমনি খোলামেলা থাকতো যেমন আপন পুত্র ও ভাইয়ের সাথে থাকা হয়। তার সাথে দত্তক পিতার কন্যার এবং এ পিতার মৃত্যুর পর তার বিধিবা স্ত্রীর বিবাহ ঠিক তেমনি অবৈধ মনে করা হতো যেমন সহোদর বোন ও গর্ভধারিনী মায়ের সাথে কারো বিয়ে হারাম হয়ে থাকে। পালক পুত্র মরে যাবার বা নিজের স্ত্রীকে তালাক দেবার পরও এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দত্তক পিতার জন্য সেই স্ত্রীলোককে তার আপন ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীর মতো মনে করা হতো। এ রীতিটি বিয়ে, তালাক ও উত্তরাধিকারের যেসব আইন সূরা বাকারাহ ও সূরা নিসায় আল্লাহ বর্ণনা করেছেন তার সাথে পদে পদে সংঘর্ষশীল ছিল। আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে যারা উত্তরাধিকারের প্রকৃত হকদার ছিল এ রীতি তাদের অধিকার গ্রাস করে এমন এক ব্যক্তিকে দিতো যার আদতে কোন অধিকারই ছিল না। এ আইনের দৃষ্টিতে যে সমস্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়ে হালাল ছিল এ রীতি তা হারাম করে দিতো। আর সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামী আইন যেসব নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের পথরোধ করতে চায় এ রীতি সেগুলোর বিস্তারের পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করছিল। কারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দত্তক ভিত্তিক (মুখে ডাকা) আত্মীয়তার মধ্যে যতই পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করা হোক না কেন দত্তক মা, দত্তক বোন ও দত্তক কন্যা আসল মা, বোন ও কন্যার মতো হতে পারে না। এসব কৃত্রিম আত্মীয়তার লোকাচার ভিত্তিক পবিত্রতার ওপর নির্ভর করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন প্রকৃত আত্মীয়দের মতো অবাধ মেলামেশা চলে তখন তা অনিষ্টকর ফলাফল সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না। এসব কারণে ইসলামের বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার আইন এবং যিনা হারাম হবার আইনের দাবী হচ্ছে এই যে, দত্তককে প্রকৃত সন্তানের মতো মনে করার ধারণাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে হবে।

কিন্তু এ ধারণাটি এমন পর্যায়ের নয় যে, শুধুমাত্র একটি আইনগত হুকুম হিসেবে এতটুকু কথা বলে দেয়া হলো যে, "দত্তক ভিত্তিক আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়" এবং তারপর তা খতম হয়ে যাবে। শত শত বছরের অন্ধ কুসংস্কার নিছক মুখের কথায় বদলে যাবে না। আইনগতভাবে যদি লোকেরা একথা মেনেও নিতো যে, এ আত্মীয়তা প্রকৃত আত্মীয়তা নয়, তবুও পালক মা ও পালক পুত্রের মধ্যে, পালক ভাই ও পালক বোনের

মধ্যে, পালক বাপ ও পালক মেয়ের মধ্যে এবং পালক শ্বশুর ও পালক পুত্রবধুর মধ্যে বিয়েকে লোকেরা মাকরূহ মনে করতে থাকতো। তাছাড়া তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশাও কিছু না কিছু থেকে যেতো। তাই কার্যত এ রেওয়াজটি ভেঙে ফেলাই অপরিহার্য ছিল। আর ভেঙে ফেলার এ কাজটি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতেই সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ যে কাজটি রসূল নিজে করেছেন এবং আল্লাহর হুকুমে করেছেন তার ব্যাপারে কোন মুসলমানের মনে কোন প্রকার অপছন্দনীয় হবার ধারণা থাকতে পারতো না। তাই আহ্যাব যুদ্ধের কিছু পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা করা হয় যে, তুমি নিজের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে নিজেই বিয়ে করে নাও। বনী কুরাইযাকে অবরোধ করার সময় তিনি এ হুকুমটি তামিল করেন। (সম্ভবত ইদ্দত খতম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করাই ছিল বিলম্বের কারণ। আবার এ সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের চাপও বেড়ে গিয়েছিল।)

যয়নবকে বিয়ে করার ফলে তুমুল অপপ্রচার

এ বিয়ে হওয়ার সাথে সাথেই নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে অকস্মাত ব্যাপক অপপ্রচার শুরু হয়ে যায়। মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদি সবাই তাঁর ক্রমাগত বিজয়ে জ্বলে পুড়ে মরছিল। ওহোদের পরে আহযাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ পর্যন্ত দু'টি বছর ধরে যেভাবে তারা একের পর এক মার খেতে থেকেছে তার ফলে তাদের মনে আগুন জ্বলছিল দাউদাউ করে। এখন প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধ করে আর কোন দিন তাঁকে হারাতে পারবে, এ ব্যাপারেও তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা এ বিয়ের ব্যাপারটিকে নিজেদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে এবং ধারণা করে যে, এবার আমরা মুহাম্মাদের (সা) শক্তি ও তাঁর সাফল্যের মূলে রয়েছে যে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব তাকে খতম করে দিতে পারবো। কাজেই গল্প ফাঁদা হয়, (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পুত্রবধুকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। পুত্র এ প্রেমের কথা জানতে পেরে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। আর এরপর তিনি পুত্রবধূকে বিয়ে করে ফেলেন। অথচ এটা ছিল একদম বাজে কথা। কারণ হযরত যয়নব (রা) ছিলেন নবী করীমের (সা) ফুফাত বোন। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত সময়টা অতিবাহিত হয় নবী করীমের (সা) সামনে। কোন এক সময় তাঁকে দেখে আসক্ত হবার প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? তারপর রসূল (সা) নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হয়ে হযরত যায়েদের (রা) সাথে তাঁর বিবাহ দেন। কুরাইশ বংশের মতো সম্ভ্রান্ত গোত্রের একটি মেয়েকে একজন আযাদকৃত গোলামের সাথে বিয়ে দেবার ব্যাপারে তাঁর পরিবারের কেউই রাজী ছিল না। হযরত যয়নব (রা) নিজেও এ বিয়েতে অখুশী ছিলেন। কিন্তু নবী করীমের (সা) হুকুমের সামনে সবাই হযরত যায়েদের (রা) সাথে তাঁকে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। এভাবে তাঁরা সমগ্র আরবে এ মর্মে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, ইসলাম একজন আযাদকৃত গোলামকে, অভিজাত বংশীয় কুরাইশীদের সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সত্যিই যদি হযরত যয়নবের (রা) প্রতি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন আকর্ষণ থাকতো, তাহলে যায়েদ ইবনে হারেসার (রা) সাথে তাঁকে বিয়ে দেবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি নিজেই তাঁকে বিয়ে

করতে পারতেন। কিন্তু নির্লজ্জ বিরোধীরা এসব নিরেট সত্যের উপস্থিতিতেও এ প্রেমের গল্প ফেঁদে বসে। খুব রঙ চড়িয়ে এগুলো ছড়াতে থাকে। অপপ্রচারের অভিযান ক্রমে এত প্রবল হয় যে, তার ফলে মুসলমানদের মধ্যেও তাদের তৈরি করা গল্প ছড়িয়ে পড়ে।

পর্দার প্রাথমিক বিধান

শত্রুদের এ মনগড়া কাহিনী যে মুসলমানদের মুখ দিয়েও রটিত হতে বাধেনি, এ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, সমাজে যৌনতার উপাদান সীমাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। সমাজ জীবনে এ নোংরামিটা যদি না থাকতো তাহলে এ ধরনের পাক-পবিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এমন ভিত্তিহীন, অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মনগড়া কাহিনী মুখে উচ্চারিত হওয়া তো দূরের কথা সেদিকে কারো বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করাও সম্ভবপর হতো না। যে সংস্কারমূলক বিধানটিকে "হিজাব" (পর্দা) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এটি ছিল ইসলামী সমাজে তার প্রবর্তন শুরু করার সঠিক সময়। এ সূরা থেকেই এ সংস্কার কাজের সূচনা করা হয় এবং এক বছর পরে যখন হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদের কদর্য অভিযানটি চালানো হয় তখনই সূরা নূর নাযিল করে এ বিধানকে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করা হয়। (আরো বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরের ভূমিকা।)

রসূলের পারিবারিক জীবনের বিষয়াবলী

এ সময়ে আরো দু'টি বিষয় ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এর সম্পর্ক ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনের সাথে কিন্তু যে সত্তা আল্লাহর দীনকে সম্প্রসারিত ও বিকশিত করার জন্য প্রাণান্ত সংগ্রাম-সাধনা করে চলছিলেন এবং নিজের সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এ মহত কাজে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন তাঁর জন্য পারিবারিক জীবনে শান্তি লাভ, তাকে মানসিক অস্থিরতামুক্ত রাখা এবং মানুষের সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা ও স্বয়ং দীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যও জরুরী ছিল। তাই আল্লাহ নিজেই সরাসরি এ দু'টি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন।

প্রথম বিষয়টি ছিল, সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরম আর্থিক সংকটে ভুগছিলেন। প্রথম চার বছর তো তাঁর অর্থোপার্জনের কোন উপায়-উপকরণ ছিল না। চতুর্থ হিজরীতে বনী নযিরকে দেশান্তর করার পর তাদের পরিত্যক্ত ভূমির একটি অংশকে আল্লাহর হুকুমের মাধ্যমে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। কিন্তু তাঁর পরিবারের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। এদিকে রিসালাতের দায়িত্ব ছিল এত বিরাট যে, তাঁর দেহ, মন ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি এবং সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত এ কাজে ব্যয়িত হবার দাবী জানাচ্ছিল। ফলে নিজের অর্থোপার্জনের জন্য সামান্যতম চিন্তা ও প্রচেষ্টাও তিনি চালাতে পারতেন না। এ অবস্থায় তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ আর্থিক অনটনের কারণে যখন তাঁর মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতেন তখন তাঁর মনের ওপর দ্বিগুণ বোঝা চেপে বসতো।

দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল, হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করার আগে তাঁর চারজন স্ত্রী ছিল। তাঁরা ছিলেন ঃ হযরত সওদা (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফ্‌সা (রা) ও হযরত উম্মে সালামা (রা)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা) ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। এর ফলে বিরোধীরা এ আপত্তি উঠালো এবং মুসলমানদের মনেও এ সন্দেহ দানা বাঁধতে লাগলো যে, তাদের জন্য তো এক সংগে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা অবৈধ গণ্য করা হয়েছে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ পঞ্চম স্ত্রী রাখলেন কেমন করে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরা আহ্‌যাব নাযিল হবার সময় এ সমস্যাগুলোর উদ্ভব ঘটে এবং এখানে এগুলোই আলোচিত হয়েছে।

এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে এবং এর পটভূমি সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, এ সমগ্র সূরাটি একটি ভাষণ নয়। একই সময় একই সংগে এটি নাযিল হয়নি। বরং এটি বিভিন্ন বিধান ও ফরমান সম্বলিত। এগুলো সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী প্রসংগে একের পর এক নাযিল হয় তারপর সবগুলোকে একত্র করে একটি সূরার আকারে বিন্যস্ত করা হয়। এর নিম্নলিখিত অংশগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

এক ঃ প্রথম রুকূ'। আহ্‌যাব যুদ্ধের কিছু আগে নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে এ রুকূ'টি পড়লে পরিষ্কার অনুভূত হবে, এ অংশটি নাযিল হবার আগেই হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দিয়ে ফেলেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দত্তক সম্পর্কিত জাহেলী যুগের ধারণা, কুসংস্কার ও রসম–রেওয়াজ খতম করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। তিনি এও অনুভব করছিলেন যে, লোকেরা "পালক" সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্রেফ আবেগের ভিত্তিতে যে ধরনের স্পর্শকাতর ও কঠোর চিন্তাধারা পোষণ করে তা কোনক্রমেই খতম হয়ে যাবে না যতক্ষণ না তিনি নিজে (অর্থাৎ নবী) অগ্রবর্তী হয়ে এ রেওয়াজটি খতম করে দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারেই বড় সন্দিহান ছিলেন এবং সামনে অগ্রসর হতেও ইতস্তত করছিলেন। কারণ যদি তিনি এ সময় হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করেন তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে হাংগামা সৃষ্টি করার জন্য পূর্বে যেসব মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকরা তৈরি হয়ে বসেছিল তারা এবার একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে। এ সময় প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো নাযিল হয়।

দুই ঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে আহ্‌যাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এ দু'টি রুকূ' যে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ দু'টি হয়ে যাবার পর নাযিল হয়েছে এটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তিন ঃ চতুর্থ রুকূ' থেকে শুরু করে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তা দু'টি বিষয়বস্তু সম্বলিত। প্রথম অংশে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে নোটিশ দিয়েছেন। এ অভাব অনটনের যুগে তারা বেসবর হয়ে পড়ছিলেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা একদিকে দুনিয়া ও দুনিয়ার শোভা সৌন্দর্য এবং অন্যদিকে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাত এ দু'টির মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বেছে নাও। যদি প্রথমটি

তোমাদের কাংখিত হয় তাহলে পরিষ্কার বলে দাও। তোমাদেরকে একদিনের জন্যও এ অনটনের মধ্যে রাখা হবে না বরং সানন্দে বিদায় করে দেয়া হবে। আর যদি দ্বিতীয়টি তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে সবর সহকারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সহযোগিতা করো। পরবর্তী অংশগুলোতে এমন সামাজিক সংস্কারের দিকে অগ্রণী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যার প্রয়োজনীয়তা ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করা মন-মগজের অধিকারী ব্যক্তিগণ স্বতস্ফূর্তভাবেই অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ থেকে সংস্কারের সূচনা করতে গিয়ে নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা জাহেলী যুগের সাজসজ্জা পরিহার করো। আত্মমর্যাদা নিয়ে গৃহে বসে থাকো। বেগানা পুরুষদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করো। এ ছিল পর্দার বিধানের সূচনা।

চার ঃ ৪৬ থেকে ৪৮ পর্যন্ত আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে হযরত যয়নবের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে সম্পর্কিত। বিরোধীদের পক্ষ থেকে এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উঠানো হচ্ছিল এখানে সেসবের জবাব দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল সেগুলো সবই দূর করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে নবীর (সা) মর্যাদা কি তা জানানো হয়েছে এবং খোদ নবীকে (সা) কাফের ও মুনাফিকদের মিথ্যা প্রচারণার মুখে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

পাঁচ ঃ ৪৯ আয়াতে তালাকের আইনের একটি ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি একক আয়াত। সম্ভবত এসব ঘটনাবলী প্রসংগে কোন সময় এটি নাযিল হয়ে থাকবে।

ছয় ঃ ৫০ থেকে ৫২ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিয়ের বিশেষ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে নবীর (সা) ব্যাপারে তা প্রযোজ্য হবে না।

সাত ঃ ৫৩—৫৫ আয়াতে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদক্ষেপ উঠানো হয়েছে। এগুলো নিম্নলিখিত বিধান সম্বলিত ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহাভ্যন্তরে বেগানা পুরুষদের যাওয়া আসার ওপর বিধি-নিষেধ, সাক্ষাত করা ও দাওয়াত দেবার নিয়ম-কানুন, নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ সম্পর্কিত এ আইন যে, গৃহাভ্যন্তরে কেবলমাত্র তাঁদের নিকটতম আত্মীয়রাই আসতে পারেন, বেগানা পুরুষদের যদি কিছু বলতে হয় বা কোন জিনিস চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে বলতে ও চাইতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের ব্যাপারে এ হুকুম যে, তাঁরা মুসলমানদের জন্যে নিজেদের মায়ের মতো হারাম এবং নবীর (সা) পরও তাঁদের কারো সাথে কোন মুসলমানদের বিয়ে হতে পারে না।

আট ঃ ৫৬ থেকে ৫৭ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে ও তাঁর পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলা হচ্ছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই সংগে মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন শত্রুদের পরনিন্দা ও অন্যের ছিদ্রান্বেষণ থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং নিজেদের নবীর ওপর দরূদ পাঠ করে। এ ছাড়া এ উপদেশও দেয়া হয় যে, নবী তো অনেক বড় কথা, ঈমানদারদের তো

সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধেও অপবাদ দেয়া ও দোষারোপ করা থেকে দূরে থাকা উচিত।

নয় ঃ ৫৯ আয়াতে সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এতে সমগ্র মুসলিম নারী সমাজের যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে চাদর দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

এরপর থেকে নিয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত গুজব ছড়ানোর অভিযানের (Whispering Campaign) বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দাবাদ ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। মুনাফিক, অকাটমূর্খ ও নিকৃষ্ট লোকেরা এ অভিযান চালাচ্ছিল।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾

হে নবী![১] আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।[২] তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যে বিষয়ের ইংগিত করা হচ্ছে তার অনুসরণ করো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা সবই জানেন।[৩] আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। কর্ম সম্পাদনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৪]

১. ওপরে ভূমিকায় বর্ণনা করে এসেছি, এ আয়াত এমন এক সময় নাযিল হয় যখন হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নবকে (রা) তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অনুভব করেছিলেন এবং আল্লাহর ইশারাও এটিই ছিল যে, দত্তক সম্পর্কের ব্যাপারে জাহেলীয়াতের রসম–রেওয়াজ ও কুসংস্কারের ওপর আঘাত হানার এটিই মোক্ষম সময়। নবীর (সা) নিজেকে অগ্রসর হয়ে তাঁর দত্তক পুত্রের (যায়েদ) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা উচিত। এভাবে এ রেওয়াজটি চূড়ান্তভাবে খতম হয়ে যাবে। কিন্তু যে কারণে নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে ইতস্তত করছিলেন তা ছিল এ আশংকা যে, এর ফলে তাঁর একের পর এক সাফল্যের কারণে যে কাফের ও মুশরিকরা পূর্বেই ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল এখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করার জন্য তাঁরা একটি শক্তিশালী অস্ত্র পেয়ে যাবে। এটা তাঁর নিজের দুর্নামের আশংকা জনিত ভয় ছিল না। বরং এ কারণে ছিল যে, এর ফলে ইসলামের ওপর আঘাত আসবে, শত্রুদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়া বহু লোকের মনে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মাবে, বহু নিরপেক্ষ লোক শত্রুপক্ষে যোগ দেবে এবং স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যে যারা দুর্বল বুদ্ধি ও মননের অধিকারী তারা সন্দেহ–সংশয়ের শিকার হবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করতেন, জাহেলীয়াতের একটি রেওয়াজ পরিবর্তন করার জন্য এমন পদক্ষেপ উঠানো কল্যাণকর নয় যার ফলে ইসলামের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۞

আল্লাহ কোন ব্যক্তির দেহাভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় রাখেননি।[৫] তোমাদের যেসব স্ত্রীকে তোমরা "যিহার" করো তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননীও করেননি[৬] এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি।[৭] এসব তো হচ্ছে এমন ধরনের কথা যা তোমরা স্বমুখে উচ্চারণ করো, কিন্তু আল্লাহ এমন কথা বলেন যা প্রকৃত সত্য এবং তিনিই সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।

২. ভাষণ শুরু করে প্রথম বাক্যেই আল্লাহ নবী করীমের (সা) এ আশংকার অবসান ঘটিয়েছেন। বক্তব্যের নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে দীনের কল্যাণ কিসে এবং কিসে নয় এ বিষয়টি আমিই ভালো জানি। কোন্ সময় কোন্ কাজটি করতে হবে এবং কোন্ কাজটি অকল্যাণকর তা আমি জানি। কাজেই তুমি এমন কর্মনীতি অবলম্বন করো না যা কাফের ও মুনাফিকদের ইচ্ছার অনুসারী হয় বরং এমন কাজ করো যা হয় আমার ইচ্ছার অনুসারী। কাফের ও মুনাফিকদেরকে নয় বরং আমাকেই ভয় করা উচিত।

৩. এ বাক্যে সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, মুসলমানদেরকেও ইসলাম বিরোধীদেরকেও। এর অর্থ হচ্ছে নবী যদি আল্লাহর হুকুম পালন করে দুর্নামের ঝুঁকি মাথা পেতে নেন এবং নিজের ইজ্জত আবরুর ওপর শত্রুর আক্রমণ ধৈর্যসহকারে বরদাশ্‌ত করেন তাহলে তাঁর বিশ্বস্ততামূলক কর্মকাণ্ড আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকবে না। মুসলমানদের মধ্য থেকে যেসব লোক নবীর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবিচল থাকবে এবং যারা সন্দেহ-সংশয়ে ভুগবে তাদের উভয়ের অবস্থাই অগোচরে থাকবে না। কাফের ও মুনাফিকরা তাঁর দুর্নাম করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ বেখবর থাকবেন না। কাজেই ভয়ের কোন কারণ নেই। প্রত্যেকে যার যার কার্য অনুযায়ী যে পুরস্কার বা শাস্তি লাভের যোগ্য হবে তা সে অবশ্যই পাবে।

৪. এ বাক্যে আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তা সম্পন্ন করো এবং সারা দুনিয়ার মানুষ যদি বিরোধিতায় এগিয়ে আসে তাহলেও তার পরোয়া করো না। মানুষ যখন নিশ্চিতভাবে জানবে উমুক হুকুমটি আল্লাহ দিয়েছেন তখন সেটি পালন করার মধ্যেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে তার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এরপর তার মধ্যে কল্যাণ, সুবিধা ও প্রজ্ঞা খুঁজে বেড়ানো সেই ব্যক্তির নিজের কাজ নয় বরং তার কাজ হওয়া উচিত শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তাঁর হুকুম পালন করা। বান্দা তার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি পথ দেখাবার জন্যও যথেষ্ট

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۭ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর কাছে বেশী ন্যায়সংগত কথা।[৮] আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু।[৯] না জেনে যে কথা তোমরা বলো সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে।[১০] আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়।[১১]

এবং সাহায্য করার জন্যও। আর তিনিই এ বিষয়ের নিশ্চয়তাও দেন যে, তাঁর পথনির্দেশের আলোকে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি কখনো অশুভ ফলাফলের সম্মুখীন হবে না।

৫. অর্থাৎ একজন লোক একই সংগে মু'মিন ও মুনাফিক, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এবং সৎ ও অসৎ হতে পারে না। তার বক্ষদেশে দু'টি হৃদয় নেই যে, একটি হৃদয়ে থাকবে আন্তরিকতা এবং অন্যটিতে থাকবে আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া ভাব। কাজেই একজন লোক এক সময় একটি মর্যাদারই অধিকারী হতে পারে। সে মু'মিন হবে অথবা হবে মুনাফিক। সে কাফের হবে অথবা হবে মুসলিম। এখন যদি তোমরা কোন মু'মিনকে মুনাফিক বলো অথবা মুনাফিককে বলো মু'মিন, তাহলে তাতে প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আসল মর্যাদা অবশ্যই একটিই থাকবে।

৬. "যিহার" আরবের একটি বিশেষ পরিভাষা। প্রাচীনকালে আরবের লোকেরা স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতে করতে কখনো একথা বলে বসতো, "তোমার পিঠ আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো।" একথা কারো মুখ থেকে একবার বের হয়ে গেলেই মনে করা হতো, এ মহিলা এখন তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। কারণ সে তাকে তার মায়ের সাথে তুলনা করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন, স্ত্রীকে মা বললে বা মায়ের সাথে তুলনা করলে সে মা হয়ে যায় না। মা তো গর্ভধারিণী জন্মদাত্রী। নিছক মুখে মা বলে দিলে প্রকৃত সত্য বদলে যায় না। এর ফলে যে স্ত্রী ছিল সে তোমাদের মুখের কথায় মা হয়ে যাবে না। (এখানে যিহার সম্পর্কিত শরীয়াতের বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। যিহার সম্পর্কিত আইন বর্ণনা করা হয়েছে সূরা মুজাদিলার ২–৪ আয়াতে)

৭. এটি হচ্ছে বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য। ওপরের দু'টি বাক্যাংশ এ তৃতীয় বক্তব্যটি বুঝাবার যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

৮. এ হুকুমটি পালন করার জন্য সর্বপ্রথম যে সংশোধনমূলক কাজটি করা হয় সেটি হচ্ছে এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালক পুত্র হযরত যায়েদকে (রা) যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলার পরিবর্তে তাঁর প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কিত করে যায়েদ

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۭ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰۗىِٕكُمْ مَّعْرُوْفًا ۭ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۞

নিসন্দেহে নবী ঈমানদারদের কাছে তাদের নিজেদের তুলনায় অগ্রাধিকারী,[১২] আর নবীদের স্ত্রীগণ তাদের মা।[১৩] কিন্তু আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সাধারণ মু'মিন ও মুহাজিরদের তুলনায় আত্মীয়রা পরস্পরের বেশী হকদার। তবে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের সাথে কোন সদ্ব্যবহার (করতে চাইলে তা) তোমরা করতে পারো।[১৪] আল্লাহর কিতাবে এ বিধান লেখা আছে।

ইবনে হারেসাহ বলা শুরু করা হয়। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি ও নাসাঈ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, যায়েদ ইবনে হারেসাকে প্রথমে সবাই যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলতো। এ আয়াত নাযিল হবার পর তাঁকে যায়েদ ইবনে হারেসাহ বলা হতে থাকে। তাছাড়া এ আয়াতটি নাযিল হবার পর কোন ব্যক্তির নিজের আসল বাপ ছাড়া অন্য কারো সাথে পিতৃ সম্পর্ক স্থাপন করাকে হারাম গণ্য করা হয়। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্‌কাসের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

"যে ব্যক্তি নিজেকে আপন পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবী করে, অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।"

হাদীসে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্যান্য রেওয়াতও পাওয়া যায়। সেগুলোতে এ কাজটিকে মারাত্মক পর্যায়ের গুনাহ গণ্য করা হয়েছে।

৯. অর্থাৎ এ অবস্থাতেও খামাখা কোন ব্যক্তির সাথে তার পিতৃ–সম্পর্ক জুড়ে দেয়া ঠিক হবে না।

১০. এর অর্থ হচ্ছে, কাউকে সস্নেহে পুত্র বলে ফেললে এতে কোন গুনাহ হবে না। অনুরূপভাবে মা, মেয়ে, বোন, ভাই ইত্যাদি শব্দাবলীও যদি কারো জন্য নিছক ভদ্রতার খাতিরে ব্যবহার করা হয় তাহলে তাতে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি এরূপ নিয়ত সহকারে একথা বলা হয় যে, যাকে পুত্র ইত্যাদি বলা হবে তাকে যথার্থই এ সম্পর্কগুলোর যে প্রকৃত মর্যাদা সেই মর্যাদার অভিসিক্ত করতে হবে, এ ধরনের আত্মীয়দের যে অধিকার স্বীকৃত তা দান করতে হবে এবং তার সাথে ঠিক তেমনি সম্পর্ক

স্থাপন করতে হবে যেমন সেই পর্যায়ের আত্মীয়দের সাথে করা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটি হবে আপত্তিকর এবং এ জন্য পাকড়াও করা হবে।

১১. এর একটি অর্থ হচ্ছে, ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে যেসব ভুল করা হয়েছে আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাদেরকে আর কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, না জেনে কোন কাজ করার জন্য আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। যদি বিনা ইচ্ছায় এমন কোন কাজ করা হয় যার বাইরের চেহারা কোন নিষিদ্ধ কাজের মতো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে সেই নিষিদ্ধ কাজটি করার ইচ্ছা ছিল না। তাহলে নিছক কাজটির বাইরের কাঠামোর ভিত্তিতে আল্লাহ শাস্তি দেবেন না।

১২. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুসলমানদের এবং মুসলমানদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সম্পর্ক তা অন্যান্য সমস্ত মানবিক সম্পর্কের উর্ধ্বের এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। নবী ও মু'মিনদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজিত, অন্য কোন আত্মীয়তা ও সম্পর্ক তার সাথে কোন দিক দিয়ে সামান্যতমও তুলনীয় নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জন্য তাদের বাপ-মায়ের চাইতেও বেশী স্নেহশীল ও দয়াদ্র হৃদয় এবং তাদের নিজেদের চাইতেও কল্যাণকামী। তাদের বাপ-মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের সাথে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করতে পারে, তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে, তাদেরকে দিয়ে অন্যায় কাজ করাতে পারে, তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পক্ষে কেবলমাত্র এমন কাজই করতে পারেন যাতে তাদের সত্যিকার সাফল্য অর্জিত হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে পারে, বোকামি করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য তাই করবেন যা তাদের জন্য লাভজনক হয়। আসল ব্যাপার যখন এই তখন মুসলমানদের ওপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অধিকার আছে যে, তারা তাঁকে নিজেদের বাপ-মা ও সন্তানদের এবং নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় মনে করবে। দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে তাঁকে বেশী ভালোবাসবে। নিজেদের মতামতের ওপর তাঁর মতামতকে এবং নিজেদের ফায়সালার ওপর তাঁর ফায়সালাকে প্রাধান্য দেবে। তাঁর প্রত্যেকটি হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেবে। বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাদের হাদীসগ্রন্থে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ-

"তোমাদের কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষের চাইতে বেশী প্রিয় হই।"

১৩. ওপরে বর্ণিত এ একই বৈশিষ্টের ভিত্তিতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এও একটি বৈশিষ্ট ছিল যে, মুসলমানদের নিজেদের পালক মাতা কখনো কোন অর্থেই তাদের মা নয় কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ ঠিক তেমনিভাবে

তাদের জন্য হারাম যেমন তাদের আসল মা তাদের জন্য হারাম। এ বিশেষ বিধানটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া দুনিয়ার আর কোন মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়।

এ প্রসংগে একথাও জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ শুধুমাত্র এ অর্থে মু'মিনদের মাতা যে, তাঁদেরকে সম্মান করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এবং তাঁদের সাথে কোন মুসলমানের বিয়ে হতে পারে না। বাদবাকি অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা মায়ের মতো নন। যেমন তাদের প্রকৃত আত্মীয়গণ ছাড়া বাকি সমস্ত মুসলমান তাদের জন্য গায়ের মাহরাম ছিল এবং তাদের থেকে পর্দা করা ছিল ওয়াজিব। তাঁদের মেয়েরা মুসলমানদের জন্য বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন না, যার ফলে তাদের সাথে মুসলমানদের বিয়ে নিষিদ্ধ হতে পারে। তাঁদের ভাই ও বোনেরা মুসলমানদের জন্য মামা ও খালার পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। কোন ব্যক্তি নিজের মায়ের তরফ থেকে যে মীরাস লাভ করে তাঁদের তরফ থেকে কোন অনাত্মীয় মুসলমান সে ধরনের কোন মীরাস লাভ করে না।

এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল স্ত্রীই এ মর্যাদার অধিকারী। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও এর অন্তরভুক্ত। কিন্তু একটি দল যখন হযরত আলী ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং তাঁর সন্তানদেরকে দীনের কেন্দ্রে পরিণত করে সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে তাঁদের চারপাশে ঘোরাতে থাকে এবং এরি ভিত্তিতে অন্যান্য বহু সাহাবার সাথে হযরত আয়েশাকেও নিন্দাবাদ ও গালাগালির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে তখন কুরআন মজীদের এ আয়াত তাদের পথে প্রতিরোধ দাঁড় করায়। কারণ এ আয়াতের প্রেক্ষিতে যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবীদার হবে সে–ই তাঁকে মা বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য। শেষমেষ এ সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ অদ্ভূত দাবী করা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে এ ইখতিয়ার দিয়েছিলেন যে, তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাঁকে চান তাঁর স্ত্রীর মর্যাদায় টিকিয়ে রাখতে পারেন এবং যাঁকে চান তাঁর পক্ষ থেকে তালাক দিতে পারেন। আবু মনসুর আহমাদ ইবনে আবু তালেব তাবূরাসী কিতাবুল ইহ্‌তিজাজে যে কথা লিখেছেন এবং সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আলজিরানী যা উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে বলেন ঃ

يا ابا الحسن ان هذا الشرف باق مادمنا على طاعة الله تعالى فايتهن عصت الله تعالى بعدى بالخروج عليك فطلقها من الازواج واسقطها من شرف امهات المؤمنين –

"হে আবুল হাসান! এ মর্যাদা ততক্ষণ অক্ষুণ্ন থাকবে যতক্ষণ আমরা আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। কাজেই আমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে কেউ আমার পরে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল্লাহর নাফরমানি করবে তাকে তুমি তালাক দিয়ে দেবে এবং তাদেরকে মু'মিনদের মায়ের মর্যাদা থেকে বহিষ্কার করবে।"

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

আর হে নবী! স্মরণ করো সেই অংগীকারের কথা যা আমি নিয়েছি সকল নবীর কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও। সবার কাছ থেকে আমি নিয়েছি পাকাপোক্ত অলংঘনীয় অঙ্গীকার[১৫] যাতে সত্যবাদীদেরকে (তাদের রব) তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন[১৬] এবং কাফেরদের জন্য তো তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করেই রেখেছেন।[১৭]

হাদীস বর্ণনার রীতি ও মূলনীতির দিক দিয়ে তো এ রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এ সূরার ২৮–২৯ এবং ৫১ ও ৫২ আয়াত ৪টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে তিনি জানতে পারবেন যে, এ রেওয়ায়াতটি কুরআনেরও বিরোধী। কারণ ইখ্‌তিয়ার সম্পর্কিত আয়াতের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসকল স্ত্রী সর্বাবস্থায় তাঁর সাথে থাকা পছন্দ করেছিলেন তাঁদেরকে তালাক দেবার ইখ্‌তিয়ার আর রসূলের (সা) হাতে ছিল না। সামনের দিকে ৪২ ও ৯৩ টীকায় এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

এ ছাড়াও একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিই ব্যবহার করে এ রেওয়ায়াতটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করেন তাহলেও তিনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন এটি একটি চরম ভিত্তিহীন এবং রসূলে পাকের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অবমাননাকর মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। রসূল তো অতি উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী, তাঁর কথাই আলাদা, এমন কি একজন সাধারণ ভদ্রলোকের কাছেও এ আশা করা যেতে পারে না যে, তিনি মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেবার কথা চিন্তা করবেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় নিজের জামাতাকে এই ইখতিয়ার দিয়ে যাবেন যে, যদি কখনো তার সাথে তোমার ঝগড়া হয় তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে তালাক দিয়ে দেবে। এ থেকে জানা যায়, যারা আহ্‌লে বায়তের প্রেমের দাবীদার তারা গৃহস্বামীর (সাহেবে বায়েত) ইজ্জত ও আবরুর কতোটা পরোয়া করেন। আর এরপর তারা মহান আল্লাহর বাণীর প্রতিও কতটুকু মর্যাদা প্রদর্শন করেন সেটিও দেখার বিষয়।

১৪. এ আয়াতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তো মুসলমানদের সম্পর্কের ধরন ছিল সবকিছু থেকে আলাদা। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে আত্মীয়দের অধিকার পরস্পরের ওপর সাধারণ লোকদের তুলনায় অগ্রগণ্য হয়। নিজের মা–বাপ, সন্তান–সন্ততি ও ভাইবোনদের প্রয়োজন পূর্ণ না করে বাইরে দান–খয়রাত করে বেড়ালে

তা সঠিক গণ্য হবে না। যাকাতের মাধ্যমে প্রথমে নিজের গরীব আত্মীয় স্বজনদেরকে সাহায্য করতে হবে এবং তারপর অন্যান্য হকদারকে দিতে হবে। মীরাস অপরিহার্যভাবে তারাই লাভ করবে যারা হবে মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়। অন্যদেরকে সে চাইলে (জীবিতাবস্থায়) হেবা, ওয়াকফ বা অসিয়াতের মাধ্যমে নিজের সম্পদ দান করতে পারে। কিন্তু এও ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে সে সবকিছু অন্যদেরকে দিয়ে যেতে পারে না। হিজরাতের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে নিছক দীনী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পরের ওয়ারিস হতেন, এ হুকুমের মাধ্যমে তাও রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ পরিষ্কার বলে দেন, মীরাস বন্টন হবে আত্মীয়তার ভিত্তিতে। তবে হাঁ কোন ব্যক্তি চাইলে হাদীয়া, তোহ্‌ফা, উপঢৌকন বা অসিয়াতের মাধ্যমে নিজের কোন দীনী ভাইকে সাহায্য করতে পারেন।

১৫. এ আয়াতে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, সকল নবীদের ন্যায় আপনার থেকেও আল্লাহ পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছেন সে অংগীকার আপনার কঠোরভাবে পালন করা উচিত। এ অংগীকার বলতে কোন্ অংগীকার বুঝানো হয়েছে? ওপর থেকে যে আলোচনা চলে আসছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এখানে যে অংগীকারের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ নবী নিজে আল্লাহর প্রত্যেকটি হুকুম মেনে চলবেন এবং অন্যদের তা মেনে চলার ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহর প্রত্যেকটি কথা হুবহু অন্যদের কাছে পৌছিয়ে দেবেন এবং তাকে কার্যত প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে কোন প্রকার গাফলতি করবেন না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ অংগীকারের কথা বলা হয়েছে। যেমন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ –

"আল্লাহ তোমাদের জন্য এমন দীন নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং যা অহির মাধ্যমে দান করা হয়েছে (হে মুহাম্মাদ) তোমাকে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ তাকীদ সহকারে যে, তোমরা প্রতিষ্ঠিত করবে এ দীনকে এবং এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে না।" (আশ্ শূরা, ১৩)

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ –

"আর স্মরণ করো, আল্লাহ অংগীকার নিয়েছিলেন তাদের থেকে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল এ জন্য যে, তোমরা তার শিক্ষা বর্ণনা করবে এবং তা লুকাবে না।" (আলে ইমরান, ১৮৭)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىٓ اِسْرَاۤءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ

"আর স্মরণ করো, আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না।"

(আল বাকারাহ, ৮৩)

اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ .... خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"তাদের থেকে কি কিতাবের অংগীকার নেয়া হয়নি?.......সেটিকে মজবুতভাবে ধরো যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং সেই নির্দেশ মনে রাখো যা তার মধ্যে রয়েছে। আশা করা যায়, তোমরা আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকবে।"

(আল আরাফ, ১৬৯—১৭১)

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -

"আর হে মুসলমানরা! মনে রেখো আল্লাহর অনুগ্রহকে, যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন এবং সেই অংগীকারকে যা তিনি তোমাদের থেকে নিয়েছেন যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।" (আল মা-য়েদাহ, ৭)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের সমালোচনার আশংকায় পালক সন্তানের আত্মীয়তা সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের নিয়ম ভাংতে ইতস্তত করছিলেন বলেই মহান আল্লাহ এ অংগীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেহেতু ব্যাপারটা একটি মহিলাকে বিয়ে করার, তাই তিনি বারবার লজ্জা অনুভব করছিলেন। তিনি মনে করছিলেন, আমি যতই সৎ সংকল্প নিয়ে নিছক সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই কাজ করি না কেন শত্রু একথাই বলবে, প্রবৃত্তির তাড়নায় এ কাজ করা হয়েছে এবং এ ব্যক্তি নিছক ধোঁকা দেবার জন্য সংস্কারকের খোলস নিয়ে আছে। এ কারণেই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তুমি আমার নিযুক্ত পয়গম্বর, সকল পয়গম্বরদের মতো তোমার সাথেও আমার এ মর্মে অলংঘনীয় চুক্তি রয়েছে যে, আমি যা কিছু হুকুম করবো তাই তুমি পালন করবে এবং অন্যদেরকেও তা পালন করার হুকুম দেবে। কাজেই কারো তিরস্কার সমালোচনার পরোয়া করো না, কাউকে লজ্জা ও ভয় করো না এবং তোমাকে দিয়ে আমি যে কাজ করাতে চাই নির্দিধায় তা সম্পাদন করো।

একটি দল এ অংগীকারকে একটি বিশেষ অংগীকার অর্থে গ্রহণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের সকল নবীর কাজ থেকে এ অংগীকারটি নেয়া হয়। সেটি ছিল এই যে, তাঁরা পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁর সাথে সহযোগিতা করবেন। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ দলের দাবী হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেও নবুওয়াতের দরজা খোলা আছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকেও এ অংগীকার নেয়া হয়েছে যে, তাঁর পরেও যে নবী আসবে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

২ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ![১৮] স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ, যা (এইমাত্র) তিনি করলেন তোমাদের প্রতি, যখন সেনাদল তোমাদের ওপর চড়াও হলো আমি পাঠালাম তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধূলিঝড় এবং এমন সেনাবাহিনী রওয়ানা করলাম যা তোমরা দেখোনি।[১৯] তোমরা তখন যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা সব দেখছিলেন। যখন তারা ওপর ও নিচে থেকে তোমাদের ওপর চড়াও হলো,[২০] যখন ভয়ে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ হয়ে পড়েছিল ওষ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা প্রকার ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে তখন মু'মিনদেরকে নিদারুণ পরীক্ষা করা হলো এবং ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়া হলো।[২১]

তাঁর উম্মাত তার প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর বক্তব্য পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। যে বক্তব্য পরম্পরায় এ আয়াতটি এসেছে সেখানে তাঁর পরও নবী আসবে এবং তাঁর উম্মাতের তার প্রতি ঈমান আনা উচিত, একথা বলার কোন অবকাশই নেই। এর এ অর্থ গ্রহণ করলে এ আয়াতটি এখানে একেবারেই সম্পর্কহীন ও খাপছাড়া হয়ে যায়। তাছাড়া এ আয়াতের শব্দগুলোয় এমন কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যা থেকে এখানে অংগীকার শব্দটির সাহায্যে কোন্ ধরনের অংগীকারের কথা বলা হয়েছে তা বুঝা যেতে পারে। অবশ্যই এর ধরন জানার জন্য আমাদের কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় নবীদের থেকে গৃহীত অংগীকারসমূহের কথা বলা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি ফিরাতে হবে। এখন যদি সমগ্র কুরআন মজীদে শুধুমাত্র একটি অংগীকারের কথা বলা হতো এবং তা হতো পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের প্রতি ঈমান আনার সাথে সম্পর্কিত তাহলে এখানেও ঐ একই অংগীকারের কথা বলা হয়েছে একথা দাবী করা যথার্থ হতো। কিন্তু যে ব্যক্তিই সচেতনভাবে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে সে জানে এ কিতাবে নবীগণ এবং তাঁদের উম্মাতদের থেকে গৃহীত বহু অংগীকারের কথা বলা হয়েছে। কাজেই এসব বিভিন্ন ধরনের অংগীকারের মধ্য থেকে যে অংগীকারটি এখানকার পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে

সামঞ্জস্য রাখে একমাত্র সেটির কথা এখানে বলা হয়েছে বলে মনে করা সঠিক হবে। এখানে যে অংগীকারের উল্লেখের কোন সুযোগই নেই তার কথা এখানে বলা হয়েছে বলে মনে করা কখনই সঠিক নয়। এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কিছু লোক কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ করার নয় বরং কুরআনকে হিদায়াত করার কাজে ব্যাপৃত হয়।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ কেবলমাত্র অংগীকার নিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ অংগীকার কতটুকু পালন করা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন করবেন। তারপর যারা নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর সাথে করা অংগীকার পালন করে থাকবে তারাই অংগীকার পালনকারী গণ্য হবে।

১৭. এ রুকূ'র বিষয়বস্তু পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য একে এ সূরার ৩৬ ও ৪১ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া দরকার।

১৮. এখান থেকে ৩ রুকূ'র শেষ পর্যন্তকার আয়াতগুলো নাযিল হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী কুরাইযার যুদ্ধ শেষ করার পর। এ দু'টি রুকূ'তে আহযাব ও বনী কুরাইযার ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো পড়ার সময় আমি ভূমিকায় এ দু'টি যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি তা যেন দৃষ্টি সমক্ষে থাকে।

১৯. শত্রুসেনারা যখন মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল ঠিক তখনই এ ধূলিঝড় আসেনি। বরং অবরোধের এক মাস হয়ে যাওয়ার পর এ ধূলি ঝড় আসে। অদৃশ্য "সেনাবাহিনী" বলতে এমন সব গোপন শক্তিকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষের বিভিন্ন বিষয়াবলীতে আল্লাহর ইশারায় কাজ করতে থাকে এবং মানুষ তার খবরই রাখে না। ঘটনাবলী ও কার্যকলাপকে মানুষ শুধুমাত্র তাদের বাহ্যিক কার্যকারণের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অননুভূত পদ্ধতিতে যেসব শক্তি কাজ করে যায় সেগুলো থাকে তার হিসেবের বাইরে। অথচ অধিকাংশ সময় এসব গোপন শক্তির কার্যকারিতা চূড়ান্ত প্রমাণিত হয়। এসব শক্তি যেহেতু আল্লাহর ফেরেশতাদের অধীনে কাজ করে তাই "সেনাবাহিনী" অর্থে ফেরেশ্তাও ধরা যেতে পারে, যদিও এখানে ফেরেশ্তাদের সৈন্য পাঠাবার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।

২০. এর একটি অর্থ হতে পারে, সবদিক থেকে চড়াও হয়ে এলো। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, নজ্দ ও খয়বরের দিক থেকে আক্রমণকারীরা ওপরের দিক থেকে এবং মক্কা মো'আয্যমার দিক থেকে আক্রমণকারীরা নিচের দিক থেকে আক্রমণ করলো।

২১. এখানে মু'মিন তাদেরকে বলা হয়েছে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল বলে মেনে নিয়ে নিজেকে তাঁর অনুসারীদের অন্তরভুক্ত করেছিলেন এদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিক উভয়ই ছিল। এ প্যারাগ্রাফে মুসলমানদের দলের উল্লেখ করেছেন সামগ্রিকভাবে, এরপরের তিনটি প্যারাগ্রাফে মুনাফিকদের নীতির ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। তারপর শেষ দু'টি প্যারাগ্রাফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাচ্চা মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

স্মরণ করো যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা পরিষ্কার বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন[২২] তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল বললো, "হে ইয়াস্‌রিববাসীরা! তোমাদের জন্য এখন অবস্থান করার কোন সুযোগ নেই, ফিরে চলো।"[২৩] যখন তাদের একপক্ষ নবীর কাছে এই বলে ছুটি চাচ্ছিল যে, "আমাদের গৃহ বিপদাপন্ন,"[২৪] অথচ তা বিপদাপন্ন ছিল না[২৫] আসলে তারা (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পালাতে চাচ্ছিল। যদি শহরের বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুরা ঢুকে পড়তো এবং সেসময় তাদেরকে ফিত্‌না সৃষ্টি করার জন্য আহবান জানানো হতো,[২৬] তাহলে তারা তাতেই লিপ্ত হয়ে যেতো এবং ফিত্‌নায় শরীক হবার ব্যাপারে তারা খুব কমই ইতস্তত করতো। তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথে অংগীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না এবং আল্লাহর সাথে করা অংগীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা তো হবেই।[২৭]

২২. অর্থাৎ এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি যে, ঈমানদাররা আল্লাহর সাহায্য–সমর্থন লাভ করবে এবং তাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় দান করা হবে।

২৩. এ বাক্যটি দুই অর্থে বলা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, খন্দকের সামনে কাফেরদের মোকাবিলায় অবস্থান করার কোন অবকাশ নেই। শহরের দিকে চলো। আর এর গূঢ় অর্থ হচ্ছে, ইসলামের ওপর অবস্থান করার কোন অবকাশ নেই। এখন নিজেদের পৈতৃক ধর্মে ফিরে যাওয়া উচিত। এর ফলে সমগ্র আরব জাতির শত্রুতার মুখে আমরা যেভাবে নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছি তা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবো। মুনাফিকরা নিজ মুখে এসব কথা এ জন্য বলতো যে, তাদের ফাঁদে যে পা দেবে তাকে নিজেদের গূঢ় উদ্দেশ্য

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۭ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَاۗىِٕلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

হে নবী! তাদেরকে বলো, যদি তোমরা মৃত্যু বা হত্যা থেকে পলায়ন করো, তাহলে এ পলায়নে তোমাদের কোন লাভ হবে না। এরপর জীবন উপভোগ করার সামান্য সুযোগই তোমরা পাবে।[২৮] তাদেরকে বলো, কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আল্লাহর হাত থেকে যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চান? আর কে তাঁর রহমতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে যদি তিনি চান তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করতে? আল্লাহর মোকাবিলায় তো তারা কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী লাভ করতে পারে না।

আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে তাদেরকে খুব ভালো করেই জানেন যারা (যুদ্ধের কাজে) বাধা দেয়, যারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে, "এসো আমাদের দিকে,"[২৯] যারা যুদ্ধে অংশ নিলেও নিয়ে থাকে শুধুমাত্র নামকাওয়াস্তে।

বুঝিয়ে দেবে এবং যে তাদের কথা শুনে সতর্ক হয়ে যাবে এবং তাদেরকে পাকড়াও করবে নিজেদের শব্দের বাহ্যিক আবরণের আড়ালে গিয়ে তাদের পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে।

২৪. অর্থাৎ যখন বনু কুরাইযাও হানাদারদের সাথে হাত মিলালো তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাদল থেকে কেটে পড়ার জন্য মুনাফিকরা একটি চমৎকার বাহানা পেয়ে গেলো এবং তারা এই বলে ছুটি চাইতে লাগলো যে, এখন তো আমাদের ঘরই বিপদের মুখে পড়ে গিয়েছে, কাজেই ঘরে ফিরে গিয়ে আমাদের নিজেদের পরিবার ও সন্তানদের হেফাজত করার সুযোগ দেয়া উচিত। অথচ সেসময় সমগ্র মদীনাবাসীদের হেফাজতের দায়িত্ব ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। বনী কুরাইযার চুক্তিভংগের ফলে যে বিপদ দেখা দিয়েছিল তার হাত থেকে শহর ও শহরবাসীদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা ছিল রসূলের (সা) কাজ, পৃথক পৃথকভাবে একেকজন সৈনিকের কাজ ছিল না।

২৫. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তো এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ব্যবস্থাপনাও তাঁর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল এবং

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ
أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ
أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْ
هَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ
يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

যারা তোমাদের সাথে সহযোগিতা করার ব্যাপারে বড়ই কৃপণ।[৩০] বিপদের সময় এমনভাবে চোখ উলটিয়ে তোমাদের দিকে তাকাতে থাকে যেন কোন মৃত্যুপথযাত্রী মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিপদ চলে গেলে এই লোকেরাই আবার স্বার্থলোভী হয়ে তীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদেরকে বিদ্ধ করতে থাকে।[৩১] তারা কখনো ঈমান আনেনি, তাই আল্লাহ তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দিয়েছেন[৩২] এবং এমনটি করা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ।[৩৩] তারা মনে করছে আক্রমণকারী দল এখনো চলে যায়নি। আর যদি আক্রমণকারীরা আবার এসে যায়, তাহলে তাদের মন চায় এ সময় তারা কোথাও মরুভূমিতে বেদুইনদের মধ্যে গিয়ে বসতো এবং সেখান থেকে তোমাদের খবরাখবর নিতো। তবুও যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকেও তাহলে যুদ্ধে খুব কমই অংশ নেবে।

সেনাপতি হিসেবে তিনি এ ব্যবস্থা কার্যকর করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কাজেই সে সময় কোন তাৎক্ষণিক বিপদ দেখা দেয়নি। এ কারণে তাদের এ ধরনের ওজর পেশ করা কোন পর্যায়েও যুক্তিসংগত ছিল না।

২৬. অর্থাৎ যদি নগরে প্রবেশ করে কাফেররা বিজয়ীর বেশে এ মুনাফিকদেরকে এই বলে আহবান জানাতো, এসো আমাদের সাথে মিলে মুসলমানদেরকে খতম করো।

২৭. অর্থাৎ ওহোদ যুদ্ধের সময় তারা যে দুর্বলতা দেখিয়েছিল তারপর লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করে তারা আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছিল যে, এবার যদি পরীক্ষার কোন সুযোগ আসে তাহলে তারা নিজেদের এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কিন্তু আল্লাহকে নিছক কথা দিয়ে প্রতারণা করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তিই তাঁর সাথে কোন অংগীকার করে তাঁর সামনে তিনি পরীক্ষার কোন না কোন সুযোগ এনে দেন। এর মাধ্যমে তার সত্য ও মিথ্যা যাচাই হয়ে যায়। তাই ওহোদ যুদ্ধের মাত্র দু'বছর পরেই তিনি তার চাইতেও বেশী

বড় বিপদ সামনে নিয়ে এলেন এবং এভাবে তারা তাঁর সাথে কেমন ও কতটুকু সাচ্চা অংগীকার করেছিল তা যাচাই করে নিলেন।

২৮. অর্থাৎ এভাবে পলায়ন করার ফলে তোমাদের আয়ু বেড়ে যাবে না। এর ফলে কখনোই তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে এবং সারা দুনিয়া জাহানের ধন–দৌলত হস্তগত করতে পারবে না। পালিয়ে বাঁচলে বড় জোর কয়েক বছরই বাঁচবে এবং তোমাদের জন্য যতটুকু নির্ধারিত হয়ে আছে ততটুকুই জীবনের আয়েশ–আরাম ভোগ করতে পারবে।

২৯. অর্থাৎ এ নবীর দল ত্যাগ করো। কেন তোমরা দীন, ঈমান, সত্য ও সততার চক্করে পড়ে আছো? নিজেদেরকে বিপদ–আপদ, ভীতি ও আশংকার মধ্যে নিক্ষেপ করার পরিবর্তে আমাদের মতো নিরাপদে অবস্থান করার নীতি অবলম্বন করো।

৩০. অর্থাৎ সাচ্চা মু'মিনরা যে পথে তাদের সবকিছু উৎসর্গ করে দিচ্ছে সেপথে তারা নিজেদের শ্রম, সময়, চিন্তা ও সহায়–সম্পদ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ব্যয় করতে প্রস্তুত নয়। প্রাণপাত করা ও বিপদ মাথা পেতে নেয়া তো দূরের কথা কোন কাজেও তারা নির্দ্বিধায় মু'মিনদের সাথে সহযোগিতা করতে চায় না।

৩১. আভিধানিক দিক দিয়ে আয়াতটির দু'টি অর্থ হয়। এক, যুদ্ধের ময়দান থেকে সাফল্য লাভ করে যখন তোমরা ফিরে আসো তখন তারা বড়ই হৃদ্যতা সহকারে ও সাড়ম্বরে তোমাদেরকে স্বাগত জানায় এবং বড় বড় বুলি আউড়িয়ে এই বলে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে যে, আমরাও পাক্কা মু'মিন এবং এ কাজ সম্প্রসারণে আমরাও অংশ নিয়েছি কাজেই আমরাও গনীমাতের মালের হকদার। দুই, বিজয় অর্জিত হলে গনীমাতের মাল ভাগ করার সময় তাদের কন্ঠ বড়ই তীক্ষ্ণ ও ধারাল হয়ে যায় এবং তারা অগ্রবর্তী হয়ে দাবী করতে থাকে, আমাদের ভাগ দাও, আমরাও কাজ করেছি, সবকিছু তোমরাই লুটে নিয়ে যেয়ো না।

৩২. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা যেসব নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, যাকাত দিয়েছে এবং বাহ্যত যেসব সৎকাজ করেছে সবকিছুকে মহান আল্লাহ নাকচ করে দেবেন এবং সেগুলোর কোন প্রতিদান তাদেরকে দেবেন না। কারণ আল্লাহর দরবারে কাজের বাহ্যিক চেহারার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয় না বরং এ বাহ্য চেহারার গভীরতম প্রদেশে বিশ্বাস ও আন্তরিকতা আছে কিনা তার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয়। যখন এ জিনিস আদতে তাদের মধ্যে নেই তখন এ লোক দেখানো কাজ একেবারেই অর্থহীন। এখানে এ বিষয়টি গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যেসব লোক আল্লাহ ও রসূলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, নামায পড়ছিল, রোযা রাখছিল, যাকাতও দিচ্ছিল এবং মুসলমানদের সাথে তাদের অন্যান্য সৎকাজে শামিলও হচ্ছিল, তাদের সম্পর্কে পরিষ্কার ফায়সালা শুনিয়ে দেয়া হলো যে তারা আদতে ঈমানই আনেনি। আর এ ফায়সালা কেবলমাত্র এরি ভিত্তিতে করা হলো যে, কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে যখন কঠিন পরীক্ষার সময় এলো তখন তারা দোমনা হবার প্রমাণ দিল, দীনের স্বার্থের ওপর নিজের স্বার্থের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করলো এবং ইসলামের হেফাজতের জন্য নিজের প্রাণ, ধন–সম্পদ ও শ্রম নিয়োজিত করতে অস্বীকৃতি জানালো। এ থেকে জানা গেলো, ফায়সালার আসল ভিত্তি এসব বাহ্যিক কাজ–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

৩ রুকূ'

আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদর্শ[৩৪] এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষদিনের আকাংখী এবং বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করে।[৩৫] আর সাচ্চা মু'মিনদের (অবস্থা সে সময় এমন ছিল,[৩৬]) যখন আক্রমণকারী সেনাদলকে দেখলো তারা চিৎকার করে উঠলো, "এতো সেই জিনিসই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের দিয়েছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা পুরোপুরি সত্য ছিল।"[৩৭] এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ আরো বেশী বাড়িয়ে দিল।[৩৮] ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার পূর্ণ করে দেখালো। তাদের কেউ নিজের নজরানা পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার প্রতীক্ষায় আছে।[৩৯] তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করেনি।

কর্ম নয়। বরং মানুষের বিশ্বস্ততা কার সাথে সম্পর্কিত তারি ভিত্তিতে এর ফায়সালা সূচিত হয়। যেখানে আল্লাহ ও তাঁর দীনের প্রতি বিশ্বস্ততা নেই সেখানে ঈমানের স্বীকৃতি এবং ইবাদাত ও অন্যান্য সৎকাজের কোন মূল্য নেই।

৩৩. অর্থাৎ তাদের কার্যাবলীর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই। ফলে সেগুলো নষ্ট করে দেয়া আল্লাহর কাছে মোটেই কষ্টকর হবে না। তাছাড়া তারা এমন কোন শক্তিই রাখে না যার ফলে তাদের কার্যাবলী ধ্বংস করে দেয়া তাঁর জন্য কঠিন হতে পারে।

৩৪. যে প্রেক্ষাপটে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা যায়, যারা আহ্‌যাব যুদ্ধে সুবিধাবাদী ও পিঠ বাঁচানের নীতি অবলম্বন করেছিল তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই নবী করীমের (সা) কর্মধারাকে এখানে আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা ছিলে ঈমান, ইসলাম ও রসূলের আনুগত্যের দাবীদার। তোমাদের দেখা উচিত ছিল, তোমরা যে রসূলের অনুসারীদের অন্তরভুক্ত হয়েছো তিনি এ অবস্থায় কোন্ ধরনের নীতি অবলম্বন করেছিলেন। যদি কোন দলের নেতা নিজেই নিরাপদ থাকার নীতি অবলম্বন করেন, নিজেই আরামপ্রিয় হন, নিজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণকে

অগ্রাধিকার দেন, বিপদের সময় নিজেই পালিয়ে যাবার প্রস্তুতি করতে থাকেন, তাহলে তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে এ দুর্বলতাগুলোর প্রকাশ যুক্তিসংগত হতে পারে। কিন্তু এখানে তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে, অন্যদের কাছে তিনি যে কষ্ট স্বীকার করার জন্য দাবী জানান তার প্রত্যেকটি কষ্ট স্বীকার করার ব্যাপারে তিনি সবার সাথে শরীক ছিলেন, সবার চেয়ে বেশী করে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমন কোন কষ্ট ছিল না যা আন্যেরা বরদাশ্‌ত করেছিল কিন্তু তিনি করেননি। খন্দক খননকারীদের দলে তিনি নিজে শামিল ছিলেন। ক্ষুধা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে তিনি সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবরোধকালে তিনি সর্বক্ষণ যুদ্ধের ময়দানে হাজির ছিলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও শত্রুদের সামনে থেকে সরে যাননি। বনী কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার পরে সমস্ত মুসলমানদের সন্তান ও পরিবারবর্গ যে বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাঁর সন্তান ও পরিবারবর্গও সেই একই বিপদের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তিনি নিজের সন্তান ও পরিবারবর্গের হেফাজতের জন্য এমন কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেননি যা অন্য মুসলমানদের জন্য করেননি। যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে ত্যাগ ও কুরবানীর দাবী করছিলেন সে উদ্দেশ্যে সবার আগে এবং সবার চেয়ে বেশী করে তিনি নিজে নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই যে কেউ তাঁর অনুসরণের দাবীদার ছিল তাকে এ আদর্শ দেখে তারই অনুসরণ করা উচিত ছিল।

পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এ ছিল এ আয়াতের নির্গলিতার্থ। কিন্তু এর শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং এর উদ্দেশ্যকে কেবলমাত্র এ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার কোন কারণ নেই। আল্লাহ একথা বলেননি যে, কেবলমাত্র এ দৃষ্টিতেই তাঁর রসূলের জীবন মুসলমানদের জন্য আদর্শ বরং শর্তহীন ও অবিমিশ্রভাবে তাকে আদর্শ গণ্য করেছেন। কাজেই এ আয়াতের দাবী হচ্ছে, মুসলমানরা সকল বিষয়েই তাঁর জীবনকে নিজেদের জন্য আদর্শ জীবন মনে করবে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র ও জীবন গড়ে তুলবে।

৩৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে গাফিল তার জন্য এ জীবন আদর্শ নয়। কিন্তু তার জন্য অবশ্যই আদর্শ যে কখনো কখনো ঘটনাক্রমে আল্লাহর নাম নেয় না বরং বেশী করে তাঁকে স্মরণ করে ও স্মরণ রাখে। অনুরূপভাবে এ জীবন এমন ব্যক্তির জন্যও কোন আদর্শ নয় যে আল্লাহর কাছ থেকেও কিছু আশা করে না এবং আখেরাতের আগমনেরও প্রত্যাশা করে না। কিন্তু এমন ব্যক্তির জন্য তা অবশ্যই আদর্শ যে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দান আশা করে এবং যে একথা চিন্তা করে যে, একদিন আখেরাতের জীবন শুরু হবে যেখানে দুনিয়ার জীবনে তার মনোভাব ও নীতি আল্লাহর রসূলের (সা) মনোভাব ও নীতির কতটুকু নিকটতর আছে তার ওপরই তার সমস্ত কল্যাণ নির্ভর করবে।

৩৬. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর এবার আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারাকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরছেন, যাতে ঈমানের মিথ্যা দাবীদার এবং আন্তরিকতা সহকারে রসূলের আনুগত্যকারীদের কার্যাবলীকে পরস্পরের মোকাবেলায় পুরোপুরিভাবে সুস্পষ্ট করে দেয়া যায়। যদিও বাহ্যিক ঈমানের স্বীকারোক্তির ব্যাপারে তারা এবং এরা একই পর্যায়ভুক্ত ছিল, উভয়কেই মুসলমানদের দলভুক্ত গণ্য করা হতো এবং নামাযে উভয়ই শরীক হতো

কিন্তু পরীক্ষার মুহূর্ত আসার পর উভয়ই পরস্পর থেকে ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যায় এবং পরিষ্কার জানা যায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বস্ত কে এবং কে কেবল নিছক নামের মুসলমান?

৩৭. এ প্রসংগে ১২ আয়াতটি দৃষ্টিসমক্ষে রাখা উচিত। সেখানে বলা হয়েছিল, যারা ছিল মুনাফিক ও হৃদয়ের রোগে আক্রান্ত, তারা দশ বারো হাজার সৈন্যকে সামনে থেকে এবং বনী কুরাইযাকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে দেখে চিৎকার করে বলতে থাকে, "আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) আমাদের সাথে যেসব অংগীকার করেছিলেন সেগুলো ডাহা মিথ্যা ও প্রতারণা প্রমাণিত হলো। আমাদের বলা তো হয়েছিল, আল্লাহর দীনের প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তোমাদের পেছনে থাকবে, আরবে ও আজমে তোমাদের ডংকা বাজবে এবং রোম ও ইরানের সম্পদ তোমাদের করায়ত্ত হবে কিন্তু এখন দেখছি সমগ্র আরব আমাদের খতম করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং আমাদেরকে এ বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য কোথাও ফেরেশতাদের সৈন্যদলের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না।" এখন বলা হচ্ছে, ঐ সব মিথ্যা ঈমানের দাবীদার আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অংগীকারের যে অর্থ বুঝেছিল এর একটি তাই ছিল। সাচ্চা ঈমানদাররা এর যে অর্থ বুঝেছে সেটি এর দ্বিতীয় অর্থ। বিপদের ঘনঘটা দেখে আল্লাহর অংগীকারের কথা তাদেরও মনে পড়েছে কিন্তু এ অংগীকার নয় যে, ঈমান আনার সাথে সাথেই কুটোটিও নাড়ার দরকার হবে না সোজা তোমরা দুনিয়ার শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে যাবে এবং ফেরেশতারা এসে তোমাদের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবে। বরং এ অংগীকার যে, কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে, বিপদের পাহাড় তোমাদের মাথায় ভেঙে পড়বে, তোমাদের চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তবেই কোন পর্যায়ে আল্লাহর অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি বর্ষিত হবে এবং তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের এমনসব সাফল্য দান করা হবে যেগুলো দেবার অংগীকার আল্লাহ মু'মিন বান্দাদের সাথে করেছিলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ٥

"তোমরা কি একথা মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা জান্নাতে এমনিই প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছিল তারা যে অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি। তারা কাঠিন্য ও বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদেরকে নাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, এমনকি রসূল ও তার সংগীসাথীরা চিৎকার করে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে!—শোনো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই আছে।" (আল বাকারাহ, ২১৪)

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ٥ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ٥

"লোকেরা কি একথা মনে করে নিয়েছে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ এদের আগে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে অবশ্যই দেখতে হবে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।" (আল আনকাবূত, ২–৩)

৩৮. অর্থাৎ বিপদ আপদের এ পাহাড় দেখে তাদের ঈমান নড়ে যাবার পরিবর্তে আরো বেশী বেড়ে গেলো এবং আল্লাহর হুকুম পালন করা থেকে দূরে পালিয়ে যাবার পরিবর্তে তারা আরো বেশী প্রত্যয় ও নিশ্চিন্ততা সহকারে নিজেদের সবকিছু তাঁর হাতে সোপর্দ করতে উদ্যোগী হয়ে উঠলো।

এ প্রসংগে একথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, ঈমান ও আত্মসমর্পণ আসলে মনের এমন একটি অবস্থা যা দীনের প্রত্যেকটি হুকুম ও দাবীর মুখে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। দুনিয়ার জীবনে প্রতি পদে পদে মানুষ এমন অবস্থার মুখোমুখি হয় যখন দীন কোন কাজের আদেশ দেয় অথবা তা করতে নিষেধ করে অথবা প্রাণ, ধন–সম্পদ, সময়, শ্রম ও প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা ত্যাগ করার দাবী করে। এ ধরনের প্রত্যেক সময়ে যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে সরে আসবে তার ঈমান ও আত্মসমর্পণে কমতি দেখা দেবে এবং যে ব্যক্তিই আদেশের সামনে মাথা নত করে দেবে তার ঈমান ও আত্মসমর্পণ বেড়ে যাবে যদিও শুরুতে মানুষ কেবলমাত্র ইসলাম গ্রহণ করতেই মু'মিন ও মুসলিম রূপে গণ্য হয়ে যায় কিন্তু এটা কোন স্থির ও স্থবির অবস্থা নয়। এ অবস্থা কেবল এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না। বরং এর মধ্যে উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। আনুগত্য ও আন্তরিকতার অভাব ও স্বল্পতা এর অবনতির কারণ হয়। এমনকি এক ব্যক্তি পেছনে হটতে হটতে ঈমানের শেষ সীমানায় পৌছে যায়, যেখান থেকে চুল পরিমাণ পেছনে হটলেই সে মু'মিনের পরিবর্তে মুনাফিক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আন্তরিকতা যত বেশী হতে থাকে, আনুগত্য যত পূর্ণতা লাভ করে এবং আল্লাহর সত্য দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার ফিকির, আকাংখা ও আত্মনিমগ্নতা যত বেড়ে যেতে থাকে সেই অনুপাতে ঈমানও বেড়ে যেতে থাকে। এভাবে এক সময় মানুষ "সিদ্দীক" তথা পূর্ণ সত্যবাদীর মর্যাদায় উন্নীত হয়। কিন্তু এই তারতম্য ও হ্রাসবৃদ্ধি কেবল নৈতিক মর্যাদার মধ্যেই সীমিত থাকে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে এর হিসেব করা সম্ভব নয়। বান্দাদের জন্য একটি স্বীকারোক্তি ও সত্যতার ঘোষণাই ঈমান। এর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান ইসলামে প্রবেশ করে এবং যতদিন সে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে ততদিন তাকে মুসলমান বলে মেনে নেয়া হয়। তার সম্পর্কে আমরা একথা বলতে পারি না যে, সে আধা মুসলমান অথবা সিকি মুসলমান কিংবা দ্বিগুণ মুসলমান বা ত্রিগুণ মুসলমান। এ ধরনের আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মুসলমান সমান। কাউকে আমরা বেশী মু'মিন বলতে পারি না এবং তার অধিকারও বেশী হতে পারে না। আবার কাউকে কম মু'মিন গণ্য করে তার অধিকার কম করতে পারি না। এসব দিক দিয়ে ঈমান কমবেশী হবার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। আসলে এ অর্থেই ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন ঃ

الايمان لا يزيد ولا ينقص

অর্থাৎ "ঈমান কমবেশী হয় না।" (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আনফাল ২ এবং আল ফাত্‌হ ৭ টীকা)

لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ
أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن
صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ
فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

(এসব কিছু হলো এ জন্য) যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতার পুরস্কার দেন এবং মুনাফিকদেরকে চাইলে শাস্তি দেন এবং চাইলে তাদের তাওবা কবুল করে নেন। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

আল্লাহ কাফেরদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন, তারা বিফল হয়ে নিজেদের অন্তরজ্বালা সহকারে এমনিই ফিরে গেছে এবং মু'মিনদের পক্ষ থেকে লড়াই করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। তারপর আহ্‌লি কিতাবদের মধ্য থেকে যারাই এর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছিল[৪০] *তাদের দুর্গ থেকে আল্লাহ তাদেরকে নামিয়ে এনেছেন এবং তাদের অন্তরে তিনি এমন ভীতি সঞ্চার করেছেন যার ফলে আজ তাদের একটি দলকে তোমরা হত্যা করছো এবং অন্য একটি দলকে করছো বন্দী। তিনি তোমাদেরকে তাদের জায়গা–জমি, ঘরবাড়ি ও ধন–সম্পদের ওয়ারিস করে দিয়েছেন এবং এমন এলাকা তোমাদের দিয়েছেন যাকে তোমরা কখনো পদানত করোনি। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন।*

৩৯. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং কেউ তাঁর দীনের খাতিরে নিজের খুনের নজরানা পেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

৪০. অর্থাৎ ইহুদি বনী কুরাইযা।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَـٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَـٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

৪ রুকূ'

হে নবী![৪১] তোমার স্ত্রীদেরকে বলো, যদি তোমরা দুনিয়া এবং তার ভূষণ চাও, তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতের প্রত্যাশী হও, তাহলে জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[৪২]

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কোন সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।[৪৩] আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ কাজ।[৪৪]

৪১. এখান থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত আহ্‌যাব ও বনী কুরাইযার যুদ্ধের সন্নিহিত সময়ে নাযিল হয়েছিল। ভূমিকায় আমি এগুলোর পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) সেযুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) নবী করীমের (সা) খেদমতে হাজির হয়ে দেখেন তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর চারদিকে বসে আছেন এবং তিনি কোন কথা বলছেন না। নবী করীম (সা) হযরত উমরকে সম্বোধন করে বললেন, هُنَّ كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِى النَّفَقَةَ "তুমি দেখতে পাচ্ছো, এরা আমার চারদিকে বসে আছে এবং আমার কাছে খরচপত্রের জন্য টাকা চাচ্ছে।" একথা শুনে তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ মেয়েকে ধমক দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছো এবং এমন জিনিস চাচ্ছো যা তাঁর কাছে নেই। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আর্থিক সংকট সে সময় কেমন ঘনীভূত ছিল এবং কুফর ও ইসলামের চরম দ্বন্দ্বের দিনগুলোতে খরচপাতির জন্য পবিত্র স্ত্রীগণের তাগাদা তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্বকে কিভাবে বিচলিত করে তুলছিল।

৪২. এ আয়াতটি নাযিল হবার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিল চারজন। তাঁরা ছিলেন হযরত সওদা (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা) এবং

হযরত উম্মে সালামাহ (রা)। তখনো হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী করীমের (সা) বিয়ে হয়নি। (আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী, ১৯৫৮ সালে মিসর থেকে মুদ্রিত, ৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১২—৫১৩) এ আয়াত নাযিল হবার পর নবী করীম (সা) সর্বপ্রথম হযরত আয়েশার সাথে আলোচনা করেন এবং বলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, জবাব দেবার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। তোমার বাপ–মায়ের মতামত নাও এবং তারপর ফায়সালা করো।" তারপর তিনি তাঁকে বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ হুকুম এসেছে এবং তাঁকে এ আয়াত শুনিয়ে দেন। হযরত আয়েশা বলেন, "এ ব্যাপারটি কি আমি আমার বাপ–মাকে জিজ্ঞেস করবো? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে চাই।" এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এক করে তাঁর অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীদের প্রত্যেকের কাছে যান এবং তাঁদেরকে একই কথা বলেন। তাঁরা প্রত্যেকে হযরত আয়েশার (রা) মতো একই জবাব দেন। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ও নাসাঈ)

ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় "তাখ্‌ঈর"। অর্থাৎ স্ত্রীকে তার স্বামীর সাথে থাকার বা আলাদা হয়ে যাবার মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার ফায়সালা করার ইখতিয়ার দান করা। এই তাখ্‌ঈর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওয়াজিব ছিল। কারণ আল্লাহ তাঁকে এর হুকুম দিয়েছিলেন। যদি তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের কেউ আলাদা হয়ে যাবার পথ অবলম্বন করতেন তাহলে তিনি আপনা আপনিই আলাদা হয়ে যেতেন না বরং নবী করীমের (সা) আলাদা করে দেবার কারণে আলাদা হয়ে যেতেন যেমন আয়াতের শব্দাবলী থেকে সুস্পষ্ট হচ্ছে ঃ "এসো আমি কিছু দিয়ে তোমাদের ভালোভাবে বিদায় করে দেই।" কিন্তু এ অবস্থায় তাঁকে আলাদা করে দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওয়াজিব ছিল। কারণ নিজের প্রতিশ্রুতি পালন না করা নবী হিসেবে তাঁর জন্য সমীচীন ছিল না। আলাদা হয়ে যাবার পর বাহ্যত এটাই মনে হয়, মু'মিনের মাতার তালিকা থেকে তাঁর নাম কাটা যেতো এবং অন্য মুসলমানের সাথে তাঁর বিবাহ আর হারাম থাকতো না। কারণ তিনি দুনিয়া এবং তার সাজসজ্জার জন্যই তো রসূলে করীমের (সা) থেকে আলাদা হতেন এবং এর অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। আর একথা সুস্পষ্ট যে, অন্য কারো সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকলে তাঁর এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো না। অন্যদিকে আয়াতের এটিও একটি উদ্দেশ্য মনে হয়, নবী করীমের (সা) যে সকল স্ত্রী আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে পছন্দ করে নিয়েছেন তাঁদেরকে তালাক দেবার, ইখতিয়ার নবীর আর থাকেনি। কারণ তাখ্‌ঈরের দু'টি দিক ছিল। এক, দুনিয়াকে গ্রহণ করলে তোমাদেরকে আলাদা করে দেয়া হবে। দুই, আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতকে গ্রহণ করলে তোমাদের আলাদা করে দেয়া হবে না। এখন একথা সুস্পষ্ট, এ দু'টি দিকের মধ্য থেকে যে কোন একটি দিকই কোন মহিমান্বিতা মহিলা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় দিকটি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যেতো।

ইসলামী ফিক্‌হে "তাখ্‌ঈর" আসলে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করার পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ স্বামী এর মাধ্যমে স্ত্রীকে এ ক্ষমতা দেয় যে, সে চাইলে তার স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে এবং চাইলে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে ফকীহগণ যে বিধান বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ এ ক্ষমতা একবার স্ত্রীকে দিয়ে দেবার পর স্বামী আর তা ফেরত নিতে পারে না এবং স্ত্রীকে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতেও পারে না। তবে স্ত্রীর জন্য তা ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে যায় না। সে চাইলে স্বামীর সাথে থাকতে সম্মত হতে পারে, চাইলে আলাদা হয়ে যাবার কথা ঘোষণা করতে পারে এবং চাইলে কোন কিছুর ঘোষণা না দিয়ে এ ক্ষমতাকে এমনিই নষ্ট হয়ে যাবার সুযোগ দিতে পারে।

দুই ঃ এ ক্ষমতাটি স্ত্রীর দিকে স্থানান্তরিত হবার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমত স্বামী কর্তৃক তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তালাকের ইখতিয়ার দান করা চাই, অথবা তালাকের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় না বললেও এই ইখতিয়ার দেবার নিয়ত তার থাকা চাই। যেমন, সে যদি বলে, "তোমার ইখতিয়ার আছে" বা "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে আছে," তাহলে এ ধরনের ইংগিতধর্মী কথার ক্ষেত্রে স্বামীর নিয়ত ছাড়া তালাকের ইখতিয়ার স্ত্রীর কাছে স্থানান্তরিত হবে না। যদি স্ত্রী এর দাবী করে এবং স্বামী হলফ সহকারে বিবৃতি দেয় যে, এর মাধ্যমে তালাকের ইখতিয়ার সোপর্দ করার উদ্দেশ্য তার ছিল না, তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণ করা হবে। তবে স্ত্রী যদি এ মর্মে সাক্ষ্য হাজির করে যে, অবনিবনা ঝগড়া বিবাদের পরিবেশে বা তালাকের কথাবার্তা চলার সময় একথা বলা হয়েছিল, তাহলে তখন তার দাবী বিবেচিত হবে। কারণ এ প্রেক্ষাপটে ইখতিয়ার দেবার অর্থ এটাই বুঝা যাবে যে, স্বামীর তালাকের ইখতিয়ার দেবার নিয়ত ছিল। দ্বিতীয়ত স্ত্রীর জানতে হবে যে, তাকে এ ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। যদি সে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার কাছে এ খবর পৌছুতে হবে এবং যদি সে উপস্থিত থাকে, তাহলে এ শব্দগুলো তার শুনতে হবে। যতক্ষণ সে নিজ কানে শুনবে না অথবা তার কাছে খবর পৌছুবে না ততক্ষণ ইখতিয়ার তার কাছে স্থানান্তরিত হবে না।

তিন ঃ যদি স্বামী কোন সময় নির্ধারণ করা ছাড়াই শর্তহীনভাবে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দান করে, তাহলে স্ত্রী কতক্ষণ পর্যন্ত এ ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে? এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ পাওয়া যায়। একটি দল বলেন, যে বৈঠকে স্বামী একথা বলে সেই বৈঠকেই স্ত্রী তার ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। যদি সে কোন জবাব না দিয়ে সেখান থেকে উঠে যায় অথবা এমন কাজে লিপ্ত হয় যা একথাই প্রমাণ করে যে, সে জবাব দিতে চায় না, তাহলে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এ মত পোষণ করেন হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হযরত জাবের ইবনে যায়েদ, আতা (র), মুজাহিদ (র), শা'বী (র), ইবরাহীম নাখঈ (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম আওযায়ী (র), সুফিয়ান সওরী (র) ও আবু সওর (র)। দ্বিতীয় দলের মতে, তার ইখতিয়ার ঐ বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তারপরও সে এ ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে। এ মত পোষণ করেন হযরত হাসান বসরী (র), কাতাদাহ ও যুহরী।

চার ঃ স্বামী যদি সময় নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, সে যদি বলে, এক মাস বা এক বছর পর্যন্ত তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম অথবা এ সময় পর্যন্ত তোমার বিষয় তোমার হাতে রইলো, তাহলে ঐ সময় পর্যন্ত সে এ ইখতিয়ার ভোগ করবে। তবে যদি সে বলে, তুমি যখন চাও এ ইখতিয়ার ব্যবহার করতে পারো, তাহলে এ অবস্থায় তার ইখতিয়ার হবে সীমাহীন।

পাঁচ ঃ স্ত্রী যদি আলাদা হতে চায়, তাহলে তাকে সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত অর্থবোধক শব্দাবলীর মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে হবে। অস্পষ্ট শব্দাবলী, যার মাধ্যমে বক্তব্য সুস্পষ্ট হয় না, তা দ্বারা ইখতিয়ার প্রয়োগ কার্যকর হতে পারে না।

ছয় ঃ আইনত স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেবার জন্য তিনটি বাক্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এক, সে বলবে, "তোমার ব্যাপারটি তোমার হাতে রয়েছে।" দুই, সে বলবে, "তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে।" তিন, সে বলবে, "যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে তালাক দিলাম।" এর মধ্যে প্রত্যেকটির আইনগত ফলাফল হবে ভিন্ন রকমের ঃ

(ক) "তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রয়েছে"—এ শব্দগুলো যদি স্বামী বলে থাকে এবং স্ত্রী এর জবাবে এমন কোন স্পষ্ট কথা বলে যা থেকে বুঝা যায় যে, সে আলাদা হয়ে গেছে, তাহলে হানাফী মতে এক তালাক বায়েন হয়ে যাবে। অর্থাৎ এরপর স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর উভয়ে আবার চাইলে পরস্পরকে বিয়ে করতে পারে। আর যদি স্বামী বলে থাকে, "এক তালাক পর্যন্ত তোমার বিষয়টি তোমার হাতে রয়েছে," তাহলে এ অবস্থায় একটি 'রজঈ' তালাক অনুষ্ঠিত হবে। (অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে।) কিন্তু স্বামী যদি বিষয়টি স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করতে গিয়ে তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে অথবা একথা সুস্পষ্ট করে বলে থাকে, তাহলে সে সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের ওপর তিন তালাক আরোপ করুক অথবা কেবলমাত্র একবার বলুক আমি আলাদা হয়ে গেলাম বা নিজেকে তালাক দিলাম, এ অবস্থায় স্ত্রীর ইখতিয়ার তালাকের সমার্থক হবে।

(খ) "তোমাকে ইখতিয়ার দিলাম" শব্দগুলোর সাথে যদি স্বামী স্ত্রীকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ইখতিয়ার দিয়ে থাকে এবং স্ত্রী আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে থাকে, তাহলে হানাফীর মতে স্বামীর তিন তালাকের ইখতিয়ার দেবার নিয়ত থাকলেও একটি বায়েন তালাকই অনুষ্ঠিত হবে। তবে যদি স্বামীর পক্ষ থেকে তিন তালাকের ইখতিয়ার দেবার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীর তালাকের ইখতিয়ারের মাধ্যমে তিন তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেঈর (র) মতে, যদি স্বামী ইখতিয়ার দেবার সময় তালাকের নিয়ত করে থাকে এবং স্ত্রী আলাদা হয়ে যায়, তাহলে একটি রজ্ঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে। ইমাম মালেকের (র) মতে, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে তাহলে তিন তালাক অনুষ্ঠিত হবে আর যদি সহবাস না করে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় স্বামী এক তালাকের নিয়তের দাবী করলে তা মেনে নেয়া হবে।

(গ) "যদি তুমি চাও, তাহলে তোমাকে তালাক দিলাম"—একথা বলার পর যদি স্ত্রী তালাকের ইখতিয়ার ব্যবহার করে, তাহলে বায়েন নয় বরং একটি রজ্ঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে।

সাত ঃ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে আলাদা হবার ইখ্তিয়ার দেবার পর স্ত্রী তার স্ত্রী হয়ে থাকার জন্য নিজের সম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে কোন তালাক সংঘটিত হবে না। এ মত পোষণ করেন হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবুদ্ দারদা (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা)।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং সৎকাজ করবে তাকে আমি দু'বার প্রতিদান দেবো[৪৫] এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

হে নবীর স্ত্রীগণ। তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও।[৪৬] যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তাহলে মিহি স্বরে কথা বলো না, যাতে মনের গলদে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে, বরং পরিষ্কার সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলো।[৪৭]

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ মতই অবলম্বন করেছেন। মাসরূক হযরত আয়েশাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দেন ঃ

خَيَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ فَاخْتَرْنَهُ اَكَانَ ذٰلِكَ طَلَاقًا ؟

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন এবং তাঁরা রসূলুল্লাহরই সাথে থাকা পছন্দ করেছিলেন। একে কি তালাক বলে গণ্য করা হয়?"

এ ব্যাপারে একমাত্র হযরত আলীর (রা) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের (রা) এ অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে একটি রজঈ তালাক অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ উভয় মনীষীর অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁরাও এ ক্ষেত্রে কোন তালাক সংঘটিত হবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৪৩. এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের থেকে কোন অশ্লীল কাজের আশংকা ছিল। বরং এর মাধ্যমে নবীর স্ত্রীগণকে এ অনুভূতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ইসলামী সমাজে তাঁরা যেমন উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন সেই অনুযায়ী তাঁদের দায়িত্বও অনেক কঠিন। তাই তাঁদের নৈতিক চালচলন হতে হবে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। এটা ঠিক তেমনি যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "যদি তুমি শিরক করো তাহলে তোমার সমস্ত কৃতকর্ম বরবাদ হয়ে যাবে।" (আয্ যুমার ঃ ৬৫) এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ নবী করীম (সা) থেকে কোন শির্কের আশংকা ছিল বরং নবী করীমকে এবং তাঁর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে শির্ক কত ভয়াবহ অপরাধ এবং তাকে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলা অপরিহার্য, সে কথা বুঝানোই ছিল উদ্দেশ্য।

৪৪. অর্থাৎ তোমরা এ ভুলের মধ্যে অবস্থান করো না যে, নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তোমরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে অথবা তোমাদের মর্যাদা এত বেশী উন্নত যে, সে কারণে তোমাদেরকে পাকড়াও করা আল্লাহর জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে।

৪৫. গোনাহর জন্য দু'বার শাস্তি ও নেকীর জন্য দু'বার পুরস্কার দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যাদেরকে মানুষের সমাজে কোন উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন তারা সাধারণত জনগণের নেতা হয়ে যায় এবং জনগণের বিরাট অংশ ভালো ও মন্দ কাজে তাঁদেরকেই অনুসরণ করে চলে। তাঁদের খারাপ কাজ শুধুমাত্র তাঁদের একার খারাপ কাজ হয় না বরং একটি জাতির চরিত্র বিকৃতির কারণও হয় এবং তাঁদের ভালো কাজ শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ভালো কাজ হয় না বরং বহু লোকের কল্যাণ সাধনেরও কারণ হয়। তাই তারা যখন খারাপ কাজ করে তখন নিজেদের খারাপের সাথে সাথে অন্যদের খারাপেরও শাস্তি পায় এবং যখনি তারা সৎকাজ করে তখন নিজেদের সৎকাজের সাথে সাথে অন্যদেরকে তারা যে সৎপথ দেখিয়েছে তারও প্রতিদান লাভ করে।

আলোচ্য আয়াত থেকে এ মূলনীতিও স্থিরীকৃত হয় যে, যেখানে মর্যাদা যত বেশী হবে এবং যত বেশী বিশ্বস্ততার আশা করা হবে সেখানে মর্যাদাহানি ও অবিশ্বস্ততার অপরাধ ততবেশী কঠোর হবে এবং এ সংগে তার শাস্তিও হবে তত বেশী কঠিন। যেমন মসজিদে শরাব পান করা নিজ গৃহে শরাব পান করার চেয়ে বেশী ভয়াবহ অপরাধ এবং এর শাস্তিও বেশী কঠোর। মাহরাম নারীদের সাথে যিনা করা অন্য নারীদের সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী গোনাহের কাজ এবং এ জন্য শাস্তিও হবে বেশী কঠিন।

৪৬. এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলামে পরদা সংক্রান্ত বিধানের সূচনা করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মুসলিম পরিবারে এ সংশোধনীগুলো প্রবর্তন করা। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণকে সম্বোধন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ থেকে এ পবিত্র জীবন ধারার সূচনা হবে তখন অন্যান্য সকল মুসলিম গৃহের মহিলারা আপনা আপনিই এর অনুসরণ করতে থাকবে। কারণ এ গৃহটিই তাদের জন্য আদর্শ ছিল। এ আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে কেবলমাত্র এরি ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবী করে বসেছেন যে, এ বিধানগুলো কেবলমাত্র তাঁদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সামনের দিকে এ আয়াতগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা পাঠ করে দেখুন। এর মধ্যে কোন্‌টি এমন যা শুধুমাত্র নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাকি মুসলমান নারীদের জন্য কাঙ্খিত নয়? কেবলমাত্র নবীর স্ত্রীগণই আবর্জনামুক্ত নিষ্কলুষ

জীবন যাপন করবেন, তাঁরাই আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবেন, নামায তাঁরাই পড়বেন এবং যাকাত তাঁরাই দেবেন, আল্লাহর উদ্দেশ্য কি এটাই হতে পারতো? যদি এ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব না হতো, তাহলে গৃহকোণে নিশ্চিন্তে বসে থাকা, জাহেলী সাজসজ্জা থেকে দূরে থাকা এবং ভিন্ পুরুষদের সাথে মৃদুস্বরে কথা বলার হুকুম একমাত্র তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য সমস্ত মুসলিম নারীরা তা থেকে আলাদা হতে পারে কেমন করে? একই কথার ধারাবাহিকতায় বিধৃত সামগ্রিক বিধানের মধ্য থেকে কিছু বিধিকে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ও কিছু বিধিকে সর্বসাধারণের পালনীয় গণ্য করার পেছনে কোন ন্যায়সংগত যুক্তি আছে কি? আর "তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও"—এ বাক্যটি থেকেও এ অর্থ বুঝায় না যে, সাধারণ নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া এবং ভিন্ পুরুষদের সাথে খুব ঢলাঢলি করে কথাবার্তা বলা উচিত। বরং এ কথাটা কিছুটা এমনি ধরনের যেমন এক ভদ্রলোক নিজের সন্তানদেরকে বলে, "তোমরা বাজারের ছেলেমেয়েদের মত নও। তোমাদের গালাগালি না করা উচিত।" এ থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও বক্তা এ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করবে না যে, সে কেবলমাত্র নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য গালি দেয়াকে খারাপ মনে করে, অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ দোষ থাকলে তাতে তার কোন আপত্তি নেই।

৪৭. অর্থাৎ প্রয়োজন হলে কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে বাধা নেই কিন্তু এ সময় নারীর কথা বলার ভংগী ও ধরন এমন হতে হবে যাতে আলাপকারী পুরুষের মনে কখনো এ ধরনের কোন চিন্তার উদয় না হয় যে, এ নারীটির ব্যাপারে অন্য কিছু আশা করা যেতে পারে। তার বলার ভংগীতে কোন নমনীয়তা থাকবে না। তার কথায় কোন মনমাতানো ভাব থাকবে না। সে সজ্ঞানে তার স্বরে মাধুর্য সৃষ্টি করবে না, যা শ্রবণকারী পুরুষের আবেগকে উদ্বেলিত করে তাকে সামনে পা বাড়াবার প্ররোচনা দেবে ও সাহস যোগাবে। এ ধরনের কথাবার্তা সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার বলেন, এমন কোন নারীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয়, যার মনে আল্লাহ ভীতি ও অসৎকাজ থেকে দূরে থাকার প্রবণতা রয়েছে। অন্যকথায় বলা যায়, এটা দুশ্চরিত্রা ও বেহায়া নারীদের কথা বলার ধরন মু'মিন ও মুত্তাকী নারীদের নয়। এই সাথে সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতটিও সামনে রাখা দরকার وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (আর তারা যেন যমীনের ওপর এমনভাবে পদাঘাত করে না চলে যার ফলে যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের গোচরীভূত হয়।) এ থেকে মনে হয় বিশ্ব–জাহানের রবের পরিষ্কার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নারীরা যেন অযথা নিজেদের স্বর ও অলংকারের ধ্বনি অন্য পুরুষদেরকে না শোনায় এবং যদি প্রয়োজনে অপরিচিতদের সাথে কথা বলতে হয়, তাহলে পূর্ণ সতর্কতা সহকারে বলতে হবে। এ জন্য নারীদের আযান দেয়া নিষেধ। তাছাড়া জামায়াতের নামাযে যদি কোন নারী হাজির থাকে এবং ইমাম কোন ভুল করেন তাহলে পুরুষের মতো তার সুব্‌হানাল্লাহ বলার অনুমতি নেই, তার কেবলমাত্র হাতের ওপর হাত মেরে আওয়াজ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ইমাম সতর্ক হয়ে যান।

এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে দীন নারীকে ভিন্ পুরুষের সাথে কোমল স্বরে কথা বলার অনুমতি দেয় না এবং পুরুষদের সাথে অপ্রয়োজনে কথা বলতেও তাদেরকে নিষেধ করে, সে কি কখনো নারীর মঞ্চে এসে নাচগান করা, বাজনা বাজানো ও রঙ্গরস করা পছন্দ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَآتِينَ الزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো।[৪৮] এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না।[৪৯] নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তো চান, তোমাদের নবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে।[৫০]

করতে পারে? সে কি রেডিও-টেলিভিশনে নারীদের প্রেমের গান গেয়ে এবং সুমিষ্ট স্বরে অশ্লীল রচনা শুনিয়ে লোকদের আবেগকে উত্তেজিত করার অনুমতি দিতে পারে? নারীরা নাটকে কখনো কারো স্ত্রীর এবং কখনো কারো প্রেমিকার অভিনয় করবে, এটাকে কি সে বৈধ করতে পারে? অথবা তাদেরকে বিমানবালা (Air-hostess) করা হবে এবং বিশেষভাবে যাত্রীদের মন ভোলাবার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, কিংবা ক্লাবে, সামাজিক উৎসবে ও নারী-পুরুষের মিশ্র অনুষ্ঠানে তারা চমকপ্রদ সাজ-সজ্জা করে আসবে এবং পুরুষদের সাথে অবাধে মিলেমিশে কথাবার্তা ও ঠাট্টা-তামাসা করবে, এসবকে কি সে বৈধ বলবে? এ সংস্কৃতি উদ্ভাবন করা হয়েছে কোন্ কুরআন থেকে? আল্লাহর নাযিল করা কুরআন তো সবার সামনে আছে। সেখানে কোথাও যদি এ সংস্কৃতির অবকাশ দেখা যায় তাহলে সেখানটা চিহ্নিত করা হোক।

৪৮. মূলে বলা হয়েছে قَرْنَ কোন কোন অভিধানবিদ একে "قرار" শব্দ থেকে গৃহীত বলে মত প্রকাশ করেন আবার কেউ কেউ বলেন "وقار" থেকে গৃহীত। যদি এটি قرار থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে এর অর্থ হবে "স্থিতিবান হও", "টিকে থাকো"। আর যদি وقار থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে অর্থ হবে "শান্তিতে থাকো।", "নিশ্চিন্তে ও স্থির হয়ে বসে উভয় অবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, নারীর আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। এ বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে তাকে নিশ্চিন্তে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করে যেতে হবে। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে গৃহের বাইরে বের হতে পারে। আয়াতের শব্দাবলী থেকেও এ অর্থ প্রকাশ হচ্ছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস একে আরো বেশী সুস্পষ্ট করে দেয়। হাফেয আবু বকর বায্যার হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ নারীরা নবী করীমের (সা) কাছে নিবেদন করলো যে, পুরুষরা তো সকল শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লুটে নিয়ে গেলো। তারা জিহাদ করে এবং আল্লাহর পথে বড় বড় কাজ করে। মুজাহিদদের সমান প্রতিদান পাবার জন্য আমরা কি কাজ করবো? জবাবে বললেন ঃ

مَنْ قَعَدَتْ مِنْكُنَّ فِيْ بَيْتِهَا فَانَّهَا تَدْرِكَ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ

"তোমাদের মধ্য থেকে যে গৃহমধ্যে বসে যাবে সে মুজাহিদদের মর্যাদা লাভ করবে।" অর্থাৎ মুজাহিদ তো তখনই স্থিরচিত্তে আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারবে যখন নিজের ঘরের দিক থেকে সে পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে, তার স্ত্রী তার গৃহস্থালী ও সন্তানদেরকে আগলে রাখবে এবং তার অবর্তমানে তার স্ত্রী কোন অঘটন ঘটাবে না, এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি আশংকামুক্ত থাকবে। যে স্ত্রী তার স্বামীকে এ নিশ্চিন্ততা দান করবে সে ঘরে বসেও তার জিহাদে পুরোপুরি অংশীদার হবে। অন্য একটি হাদীস বায্যার ও তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ الْمَرْاَةَ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَاَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِىَ فِىْ قَعْرِ بَيْتِهَا -

"নারী পর্দাবৃত থাকার জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তখনই সে আল্লাহর রহমতের নিকটতর হয় যখন সে নিজের গৃহে অবস্থান করে।" (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফসীর সূরা নূর ৪৯ টীকা)

কুরআন মজীদের এ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হুকুমের উপস্থিতিতে মুসলমান নারীদের জন্য অবকাশ কোথায় কাউন্সিল ও পার্লামেন্টে সদস্য হবার, ঘরের বাইরে সামাজিক কাজকর্মে দৌড়াদৌড়ি করার, সরকারী অফিসে পুরুষদের সাথে কাজ করা, কলেজে ছেলেদের সাথে শিক্ষালাভ করার, পুরুষদের হাসপাতালে নার্সিংয়ের দায়িত্ব সম্পাদন করার, বিমানে ও রেলগাড়িতে যাত্রীদের সেবা করার দায়িত্বে নিয়োজিত হবার এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের জন্য তাদেরকে আমেরিকায় ও ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার? নারীদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার বৈধতার সপক্ষে সবচেয়ে যে যুক্তি পেশ করা হয় সেটি হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা (রা) উষ্ট্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ যুক্তি যারা পেশ করেন তারা সম্ভবত এ ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আয়েশার কি চিন্তা ছিল তা জানেন না। আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল যাওয়ায়েদুয যাহ্‌দ এবং ইবনুল মুন্‌যির, ইবনে আবী শাইবাহ ও ইবনে সা'দ তাঁদের কিতাবে মাসরূক থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) যখন কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতে পৌঁছতেন (وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ) তখন স্বতষ্ফূর্তভাবে কেঁদে ফেলতেন, এমনকি তাঁর উড়না ভিজে যেতো। কারণ এ প্রসংগে উষ্ট্র যুদ্ধে গিয়ে তিনি যে ভুল করেছিলেন সে কথা তাঁর মনে পড়ে যেতো।

৪৯. এ আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার জন্য এ দু'টি বুঝে নেয়া জরুরী। এর একটি হচ্ছে "তাবাররুজ" এবং দ্বিতীয়টি "জাহেলিয়াত।"

আরবী ভাষায় 'তাবার্‌রুজ" মানে হচ্ছে উন্মুক্ত হওয়া, প্রকাশ হওয়া এবং সুস্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যাওয়া। দূর থেকে দেখা যায় এমন প্রত্যেক উঁচু ভবনকে আরবরা "বুরুজ" বলে থাকে। দুর্গ বা প্রাসাদের বাইরের অংশের উচ্চ কক্ষকে এ জন্যই বুরুজ বলা হয়ে থাকে। পালতোলা নৌকার পাল দূর থেকে দেখা যায় বলে তাকে "বারজা" বলা হয়,

নারীর জন্য তাবারূরুজ শব্দ ব্যবহার করা হলে তার তিনটি অর্থ হবে। এক, সে তার চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য লোকদের দেখায়। দুই, সে তার পোশাক ও অলংকারের বহর লোকদের সামনে উন্মুক্ত করে। তিন, সে তার চাল–চলন ও চমক–ঠমকের মাধ্যমে নিজেকে অন্যদের সামনে তুলে ধরে। অভিধান ও তাফসীর বিশারদগণ এ শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে আবি নুজাইহ বলেন, التبرج المشى بتبختر وتكسر وتغنج "তাবাররুজের অর্থ হচ্ছে, গর্ব ও মনোরম অংগভংগী সহকারে হেলেদুলে ও সাড়ম্বরে চলা।" মুকাতিল বলেন, ابداء قلائدها وقرطها وعنقها "নিজের হার, ঘাড় ও গলা সুস্পষ্ট করা।" আল মুবারূরাদের উক্তি হচ্ছে ঃ ان تبدى من محاسنها مايجب عليها ستره "নারীর এমন গুণাবলী প্রকাশ করা যেগুলো তার গোপন রাখা উচিত।" আবু উবাইদাহর ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ

ان تخرج من محاسنها ماتستدهى به شهوة الرجال

"নারীর শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য এমনভাবে উন্মুক্ত করা যার ফলে পুরুষেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।"

জাহেলিয়াত শব্দটি কুরআন মজিদের এ জায়গা ছাড়াও আরো তিন জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। এক, আলে ইমরানের ১৫৪ আয়াত। সেখানে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যারা গা বাঁচিয়ে চলে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা "আল্লাহ সম্পর্কে সত্যের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াতের মতো ধারণা পোষণ করে।" দুই, সূরা মা–য়েদাহর ৫০ আয়াতে। সেখানে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য কারোর আইন অনুযায়ী ফায়সালাকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তারা কি জাহেলিয়াতের ফায়সালা চায়?" তিন, সূরা ফাত্হের ২৬ আয়াতে সেখানে মক্কার কাফেররা নিছক বিদ্বেষ বশত মুসলমানদের উমরাহ করতে দেয়নি বলে তাদের এ কাজকেও "জাহেলী স্বার্থান্ধতা ও জিদ" বলা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার হযরত আবু দারদা কারো সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে তার মাকে গালি দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে বলেন, "তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াত রয়ে গেছে।" অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তিনটি কাজ জাহেলিয়াতের অন্তরভুক্ত। অন্যের বংশের খোটা দেয়া, নক্ষত্রের আবর্তন থেকে ভাগ্য নির্ণয় করা এবং মৃতদের জন্য সুর করে কান্নাকাটি করা।" শব্দটির এ সমস্ত প্রয়োগ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাহেলিয়াত বলতে ইসলামী পরিভাষায় এমন প্রত্যেকটি কার্যধারা বুঝায় যা ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ইসলামী শিষ্টাচার ও নৈতিকতা এবং ইসলামী মানসিকতার বিরোধী। আর প্রথম যুগের জাহেলিয়াত বলতে এমন অসৎকর্ম বুঝায় যার মধ্যে প্রাগৈসলামিক আরবরা এবং দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত লোকেরা লিপ্ত ছিল।

এ ব্যাখ্যা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ নারীদেরকে যে কার্যধারা থেকে বিরত রাখতে চান তা হচ্ছে, তাদের নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে গৃহ থেকে বের হওয়া। তিনি তাদের আদেশ দেন, নিজেদের গৃহে অবস্থান করো। কারণ, তোমাদের আসল

কাজ রয়েছে গৃহে, বাইরে নয়। কিন্তু যদি বাইরে বের হবার প্রয়োজন হয়, তাহলে এমনভাবে বের হয়ো না যেমন জাহেলী যুগে নারীরা বের হতো। প্রসাধন ও সাজ–সজ্জা করে, সুশোভন অলংকার ও আঁটসাঁট বা হাল্‌কা মিহিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে চেহারা ও দেহের সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করে এবং গর্ব ও আড়ম্বরের সাথে চলা কোন মুসলিম সমাজের নারীদের কাজ নয়। এগুলো জাহেলিয়াতের রীতিনীতি। ইসলামে এসব চলতে পারে না। এখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই দেখতে পারেন আমাদের দেশে যে সংস্কৃতির প্রচলন করা হচ্ছে তা কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামের সংস্কৃতি না জাহেলিয়াতের সংস্কৃতি? তবে হাঁ, আমাদের কর্মকর্তাদের কাছে যদি অন্য কোন কুরআন এসে গিয়ে থাকে, যা থেকে ইসলামের এ নতুন তত্ত্ব ও ধ্যান–ধারণা বের করে তারা মুসলমানদের মধ্যে ছড়াচ্ছেন, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

৫০. যে প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এখানে আহলে বায়েত বা নবী পরিবার বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সম্বোধনের সূচনা করা হয়েছে "হে নবীর স্ত্রীগণ!" বলে এবং সামনের ও পিছনের পুরো ভাষণ তাদেরকে সম্বোধন করেই ব্যক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও যে অর্থে আমরা "পরিবারবর্গ" শব্দটি বলি এ অর্থে একজন লোকের স্ত্রী ও সন্তানরা সবাই এর অন্তরভুক্ত হয় ঠিক সেই একই অর্থে আরবী ভাষায় "আহলুল বায়েত" শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে "পরিবারবর্গ" শব্দটি কেউ ব্যবহার করে না। খোদ কুরআন মজীদেও এ জায়গা ছাড়াও আরো দু'জায়গায় এ শব্দটি এসেছে এবং সে দু'জায়গায়ও তার অর্থের মধ্যে স্ত্রী অন্তরভুক্তই শুধু নয়, অগ্রবর্তীও রয়েছে। সূরা হূদে যখন ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীমকে (আ) পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দেন তখন তাঁর স্ত্রী তা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন এই বলে যে, এ বুড়ো বয়সে আমাদের আবার ছেলে হবে কেমন করে! একথায় ফেরেশতারা বলেন ঃ

اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ

"তোমরা কি আল্লাহর কাজে অবাক হচ্ছো? হে এ পরিবারের লোকেরা! তোমাদের প্রতি তো আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত রয়েছে।"

সূরা কাসাসে যখন হযরত মূসা (আ) একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু হিসেবে ফেরাউনের গৃহে পৌছে যান এবং ফেরাউনের স্ত্রী এমন কোন ধাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন যার দুধ এ শিশু পান করবে তখন হযরত মূসার বোন গিয়ে বলেন ঃ

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهُ لَكُمْ

"আমি কি তোমাদের এমন পরিবারের খবর দেবো যারা তোমাদের জন্য এ শিশুর লালন–পালনের দায়িত্ব নেবেন?"

কাজেই ভাষার প্রচলিত কথ্যরীতি, কুরআনের বর্ণনাভংগী এবং খোদ এ আয়াতটির পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় সবকিছুই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলি বায়েতের মধ্যে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণও আছেন এবং তাঁর সন্তানরাও

আছেন। বরং বেশী নির্ভুল কথা হচ্ছে এই যে, আয়াতে মূলত সম্বোধন করা হয়েছে তাঁর স্ত্রীগণকেই এবং সন্তানরা এর অন্তরভুক্ত গণ্য হয়েছেন শব্দের অর্থের প্রেক্ষিতে। এ কারণে ইবনে আব্বাস (রা), উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) এবং ইকরামাহ বলেন, এ আয়াতে আহ্‌লে বায়েত বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু কেউ যদি বলেন, 'আহলুল বায়েত' শব্দ শুধুমাত্র স্ত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অন্য কেউ এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তাহলে একথাও ভুল হবে। "পরিবারবর্গ" শব্দের মধ্যে মানুষের সকল সন্তান-সন্ততি কেবল শামিল হয় তাই নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সুস্পষ্টভাবে তাদের শামিল হবার কথা বলেছেন। ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশাকে (রা) একবার হযরত আলী (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন ঃ

تَسْأَلُنِىْ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ اِبْنَتُهُ وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيْهِ -

"তুমি আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো যিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম লোকদের অন্তরভুক্ত এবং যার স্ত্রী ছিলেন রসূলের এমন মেয়ে যাকে তিনি মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন।" তারপর হযরত আয়েশা (রা) এ ঘটনা শুনান ঃ নবী করীম (সা) হযরত আলী ও ফাতেমা এবং হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে ডাকলেন এবং তাঁদের উপর একটি কাপড় ছড়িয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِى فَاَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا ۝

"হে আল্লাহ এরা আমার আহলে বায়েত (পরিবারবর্গ), এদের থেকে নাপাকি দূর করে দাও এবং এদেরকে পাক-পবিত্র করে দাও।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, আমিও তো আপনার আহ্‌লে বায়েতের অন্তরভুক্ত (অর্থাৎ আমাকেও এ কাপড়ের নীচে নিয়ে আমার জন্যও দোয়া করুন) নবী করীম (সা) বলেন, "তুমি আলাদা থাকো, তুমি তো অন্তরভুক্ত আছোই।" প্রায় একই ধরনের বক্তব্য সম্বলিত বহু সংখ্যক হাদীস মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে জারীর, হাকেম, বায়হাকি প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত উম্মে সালামাহ (রা), হযরত ওয়াসিলাহ ইবনে আসকা' এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা), ফাতেমা (রা) এবং তাদের দু'টি সন্তানকে নিজের আহলে বায়েত গণ্য করেন। কাজেই যাঁরা তাঁদেরকে আহলে বায়েতের বাইরে মনে করেন তাদের চিন্তা ভুল।

অনুরূপভাবে যারা উপরোক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে রসূলের পবিত্র স্ত্রীগণকে আহলে বায়েতের বাইরে গণ্য করেন তাদের মতও সঠিক নয়। প্রথমত যে বিষয়টি সরাসরি কুরআন থেকে প্রমাণিত, তাকে কোন হাদীসের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের যেসব কথা তোমাদের গৃহে শুনানো হয়।[৫১] তা মনে রেখো। অবশ্যই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী[৫২] ও সর্ব অবহিত।

দ্বিতীয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর অর্থও তা নয় যা সেগুলো থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে। এগুলোর কোন কোনটিতে এই যে কথা এসেছে যে, হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালামাকে (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই চাদরের নীচে নেননি যার মধ্যে হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনকে নিয়েছিলেন, এর অর্থ এ নয় যে, তিনি তাঁদেরকে নিজের "পরিবারের" বাইরে গণ্য করেছিলেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীগণ তো পরিবারের অন্তরগত ছিলেনই। কারণ কুরআন তাঁদেরকেই সম্বোধন করেছিল। কিন্তু নবী করীমের (সা) আশংকা হলো, এ চারজন সম্পর্কে কুরআনের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে কারো যেন ভুল ধারণা না হয়ে যায় যে, তাঁরা আহলে বায়েতের বাইরে আছেন, তাই তিনি পবিত্র স্ত্রীগণের পক্ষে নয়, তাঁদের পক্ষে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

একটি দল এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র এতটুকু বাড়াবাড়ি করেই ক্ষান্ত থাকেননি যে, পবিত্র স্ত্রীগণকে আহলে বায়েত থেকে বের করে দিয়ে কেবলমাত্র হযরত আলী (রা), ফাতেমা (রা) ও তাঁদের দু'টি সন্তানকে এর মধ্যে শামিল করেছেন বরং এর ওপর এভাবে আরো বাড়াবাড়ি করেছেন যে, "আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে ময়লা দূর করে তোমাদেরকে পুরোপুরি পবিত্র করে দিতে" কুরআনের এ শব্দগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, হযরত আলী, ফাতেমা এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের মতোই মাসূম তথা গোনাহমুক্ত নিষ্পাপ। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, "ময়লা" অর্থ ভ্রান্তি ও গোনাহ এবং আল্লাহর উক্তি অনুযায়ী আহলে বায়েতকে এগুলো থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অথচ আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের থেকে ময়লা দূর করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করা হয়েছে। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক পবিত্র করতে চান। পূর্বাপর আলোচনাও এখানে আহলে বায়েতের মর্যাদা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য একথা বলে না। বরং এখানে তো আহলে বায়েতকে এ মর্মে নসিহত করা হয়েছে, তোমরা অমুক কাজ করো এবং অমুক কাজ করো না কারণ আল্লাহ তোমাদের পাক পবিত্র করতে চান। অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা অমুক নীতি অবলম্বন করলে পবিত্রতার নিয়ামতে সমৃদ্ধ হবে অন্যথায় তা লাভ করতে পারবে না। তবুও যদি....... يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا এর অর্থ এ নেয়া হয় যে, আল্লাহ তাঁদেরকে নিষ্পাপ করে দিয়েছেন, তাহলে অযু, গোসল ও তায়াম্মুমকারী প্রত্যেক মুসলমানকে নিষ্পাপ বলে মেনে না নেয়ার কোন কারণ নেই। কারণ তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ

"কিন্তু আল্লাহ চান তোমাদেরকে পাকপবিত্র করে দিতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিতে।" (আল মা–য়েদাহ, ৬)

৫১. মূলে وَاذْكُرْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দু'টি অর্থ ঃ "মনে রেখো" এবং "বর্ণনা করো।" প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায় ঃ হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা কখনো ভুলে যেয়ো না যে, যেখান থেকে সারা দুনিয়াকে আল্লাহর আয়াত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়া হয় সেটিই তোমাদের আসল গৃহ। তাই তোমাদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। লোকেরা এ গৃহে জাহেলিয়াতের আদর্শ দেখতে থাকে, এমন যেন না হয়। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হয় ঃ হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা যা কিছু শোনো এবং দেখো তা লোকদের সামনে বর্ণনা করতে থাকো। কারণ রসূলের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থানের কারণে এমন অনেক বিধান তোমাদের গোচরীভূত হবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে লোকদের জানা সম্ভব হবে না।

এ আয়াতে দু'টি জিনিসের কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহর আয়াত, দুই, হিকমাত বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আল্লাহর আয়াত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাবের আয়াত। কিন্তু হিকমাত শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। সকল প্রকার জ্ঞানের কথা এর অন্তরভুক্ত, যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে শেখাতেন। আল্লাহর কিতাবের শিক্ষার ওপরও এ শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র তার মধ্যেই একে সীমিত করে দেবার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কুরআনের আয়াত শুনানো ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র জীবন ও নৈতিক চরিত্র এবং নিজের কথার মাধ্যমে যে হিকমাতের শিক্ষা দিতেন তাও অপরিহার্যভাবে এর অন্তরভুক্ত। কেউ কেউ কেবলমাত্র এরি ভিত্তিতে যে আয়াতে مَا يُتْلٰى (যা তেলাওয়াত করা হয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এ দাবী করেন যে আল্লাহর আয়াত ও হিকমাত মানে হচ্ছে কেবলমাত্র কুরআন। কারণ "তেলাওয়াত" শব্দটি একমাত্র কুরআন তেলাওয়াতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এ যুক্তি একেবারেই ভ্রান্ত। তেলাওয়াত শব্দটি পারিভাষিকভাবে একমাত্র কুরআন বা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া পরবর্তীকালের লোকদের কাজ। কুরআনে এ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। সূরা বাকারার ১০২ আয়াতে এ শব্দটিকেই যাদুমন্ত্রের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। শয়তানরা হযরত সুলাইমানের নামের সাথে জড়িত করে এ মন্ত্রগুলো লোকদেরকে তেলাওয়াত করে শুনাতো ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ

"তারা অনুসরণ করে এমন এক জিনিসের যা তেলাওয়াত করতো (অর্থাৎ যা শুনাতো) শয়তানরা সুলাইমানের বাদশাহীর সাথে জড়িত করে"—থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয়, কুরআন এ শব্দটিকে এর শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করে। আল্লাহর কিতাবের আয়াত শুনাবার জন্য পারিভাষিকভাবে একে নির্দিষ্ট করে না।

৫২. আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী। অর্থাৎ গোপনে এবং অতিসংগোপনে রাখা কথাও তিনি জানতে পারেন। কোন জিনিসই তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে না।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ وَالْقَٰنِتِينَ
وَالْقَٰنِتَٰتِ وَالصَّٰدِقِينَ وَالصَّٰدِقَٰتِ وَالصَّٰبِرِينَ وَالصَّٰبِرَٰتِ
وَالْخَٰشِعِينَ وَالْخَٰشِعَٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَٰتِ وَالصَّٰٓئِمِينَ
وَالصَّٰٓئِمَٰتِ وَالْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَٰفِظَٰتِ وَالذَّٰكِرِينَ اللَّهَ
كَثِيرًا وَالذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

৫ রুকূ'

একথা সুনিশ্চিত যে,[৫৩] যে পুরুষ ও নারী মুসলিম,[৫৪] মু'মিন,[৫৫] হুকুমের অনুগত,[৫৬] সত্যবাদী,[৫৭] সবরকারী,[৫৮] আল্লাহর সামনে বিনত,[৫৯] সাদকাদানকারী,[৬০] রোযা পালনকারী,[৬১] নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী[৬২] এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণকারী[৬৩] আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[৬৪]

৫৩. পিছনের প্যারাগ্রাফের পরপরই এ বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে এই মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, ওপরে রসূলের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র তাঁদের জন্যই নির্দিষ্ট নয় বরং মুসলিম সমাজের সামগ্রিক সংশোধন কাজ সাধারণভাবে এসব নির্দেশ অনুযায়ীই করতে হবে।

৫৪. অর্থাৎ যারা নিজেদের জন্য ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এখন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এ বিধানের অনুসারী হবার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে। অন্য কথায়, যাদের মধ্যে ইসলাম প্রদত্ত চিন্তাপদ্ধতি ও জীবনধারার বিরুদ্ধে কোন রকমের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার লেশমাত্র নেই। বরং তারা তার পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের পথ অবলম্বন করেছে।

৫৫. অর্থাৎ যাদের এ আনুগত্য নিছক বাহ্যিক নয়, গত্যন্তর নেই, মন চায় না তবুও করছি, এমন নয়। বরং মন থেকেই তারা ইসলামের নেতৃত্বকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। চিন্তা ও কর্মের যে পথ কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছেন সেটিই সোজা ও সঠিক পথ এবং তারই অনুসরণের মধ্যে আমাদের সাফল্য নিহিত, এটিই তাদের ঈমান। যে জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভুল বলে দিয়েছেন তাদের নিজেদের মতেও সেটি নিশ্চিতই ভুল। আর থাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) সত্য বলে দিয়েছেন তাদের নিজেদের মন-মস্তিষ্কও তাকেই সত্য বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে। তাদের চিন্তা ও মানসিক অবস্থা এমন নয়। কুরআন ও সুন্নাত থেকে যে হুকুম প্রমাণিত হয় তাকে

তারা অসংগত মনে করতে পারে এবং এ চিন্তার বেড়াজালে এমনভাবে আটকে যেতে পারে যে, কোন প্রকারে তাকে পরিবর্তিত করে নিজেদের মন মাফিক করে নেবে অথবা দুনিয়ার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তাকে ঢালাইও করে নেবে আবার এ অভিযোগও নিজেদের মাথায় নেবে না যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম কাটছাঁট করে নিয়েছি। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের সঠিক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ذَاقَ طَعَمْ الاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِا اللّٰهِ رَبًّا وَّبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً ٥

"ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে তার রব, ইসলামকে তার দীন এবং মুহাম্মাদকে তার রসূল বলে মেনে নিতে রাজি হয়ে গেছে।" (মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে তিনি এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ

لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

"তোমাদের কোন ব্যক্তি মু'মিন হয় না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অনুগত হয়ে যায়।" (শারহুস সুন্নাহ)

৫৬. অর্থাৎ তারা নিছক মেনে নিয়ে বসে থাকার লোক নয়। বরং কার্যত আনুগত্যকারী। তাদের অবস্থা এমন নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে কাজের হুকুম দিয়েছেন তাকে সত্য বলে মেনে নেবে ঠিকই কিন্তু কার্যত তার বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন নিজেরা আন্তরিকভাবে সেগুলোকে খারাপ মনে করবে কিন্তু নিজেদের বাস্তব জীবনে সেগুলোই করে যেতে থাকবে।

৫৭. অর্থাৎ নিজেদের কথায় যেমন সত্য তেমনি ব্যবহারিক কার্যকলাপেও সত্য। মিথ্যা, প্রতারণা, অসৎ উদ্দেশ্য, ঠগবৃত্তি ও ছলনা তাদের জীবনে পাওয়া যায় না। তাদের বিবেক যা সত্য বলে জানে মুখে তারা তাই উচ্চারণ করে। তাদের মতে যে কাজ ঈমানদারীর সাথে সত্য ও সততা অনুযায়ী হয় সেই কাজই তারা করে। যার সাথেই তারা কোন কাজ করে বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর সাথেই করে।

৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্দেশিত সোজা সত্য পথে চলার এবং আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে যে বাধাই আসে, যে বিপদই দেখা দেয়, যে কষ্টই সহ্য করতে হয় এবং যে সমস্ত ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়, দৃঢ়ভাবে তারা তার মোকাবিলা করে। কোনপ্রকার ভীতি, লোক ও প্রবৃত্তির কামনার কোন দাবী তাদেরকে সোজা পথ থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় না।

৫৯. অর্থাৎ তারা দম্ভ, অহংকার ও আত্মম্ভরীতামুক্ত। তারা এ সত্যের পূর্ণ সচেতন অনুভূতি রাখে যে, তারা বান্দা এবং বন্দেগীর বাইরে তাদের কোন মর্যাদা নেই। তাই তাদের দেহ ও অন্তরাত্মা উভয়ই আল্লাহর সামনে নত থাকে। আল্লাহ ভীতি তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। আত্মঅহমিকায় মত্ত আল্লাহভীতি শূন্য লোকদের থেকে যে

ধরনের মনোভাব প্রকাশিত হয় এমন কোন মনোভাব কখনো তাদের থেকে প্রকাশিত হয় না। আয়াতের বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, এখানে এ সাধারণ আল্লাহভীতি মূলক মনোভাবের সাথে বিশেষভাবে "খুশু" বা বিনত হওয়া শব্দ ব্যবহার করায় এর অর্থ হয় নামায। কারণ এরপরই সাদকাহ ও রোযার কথা বলা হয়েছে।

৬০. এর অর্থ কেবল ফরয যাকাত আদায় করাই নয় বরং সাধারণ দান-খয়রাতও এর অন্তরভুক্ত। অর্থাৎ তারা আল্লাহর পথে উন্মুক্ত হৃদয়ে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে। আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করার ব্যাপারে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাতে তারা কসুর করে না। কোন এতিম, রুগ্ন, বিপদাপন্ন, দুর্বল, অক্ষম, গরীব ও অভাবী ব্যক্তি তাদের লোকালয়ে তাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। আর আল্লাহর দীনকে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন হলে তার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে তারা কখনো কার্পণ্য করে না।

৬১. ফরয ও নফল উভয় ধরনের রোযা এর অন্তরভুক্ত হবে।

৬২. এর দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে, তারা যিনা থেকে দূরে থাকে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তারা উলংগতাকে এড়িয়ে চলে। এই সাথে এটাও বুঝে নিতে হবে যে, কেবলমাত্র মানুষের পোশাক না পরে উলংগ হয়ে থাকাকে উলংগতা বলে না বরং এমন ধরনের পোশাক পরাও উলংগতার অন্তরভুক্ত, যা এতটা সূক্ষ্ম হয় যে, তার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় অথবা এমন চোস্ত ও আঁটসাঁট হয় যার ফলে তার সাহায্যে দৈহিক কাঠামো ও দেহের উঁচু-নীচু অংগ সবই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৬৩. আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজেকর্মে সমস্ত ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায়। মানুষের মনে আল্লাহর চিন্তা পুরোপুরি ও সর্বব্যাপী আসন গেঁড়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরনের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। মানুষের চেতনার জগত অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীরদেশেও এ চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোন কথা বললে বা কোন কাজ করলে তার মধ্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যাবে। আহার করলে 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করবে। আহার শেষ করবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম ভাঙবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে। কথাবার্তায় তার মুখে বারবার বিসমিল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ এবং এ ধরনের অন্য শব্দ ও বাক্য বারবার উচ্চারিত হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যাপারে বারবার সে আল্লাহর সাহায্য চাইবে। প্রত্যেকটি নিয়ামত লাভ করার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। প্রত্যেকটি বিপদ আসার পর তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হবে। প্রত্যেক সংকটে তাঁর দিকে মুখ ফিরাবে। কোন খারাপ কাজের সুযোগ এলে তাঁকে ভয় করবে। কোন ভুল বা অপরাধ করলে তাঁর কাছে মাফ চাইবে। প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও অভাবের মুহূর্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। মোটকথা উঠতে বসতে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর স্মরণ হয়ে থাকবে তার কন্ঠলগ্ন। এ জিনিসটি আসলে ইসলামী জীবনের প্রাণ। অন্য যে কোন ইবাদাতের জন্য কোন না কোন সময় নির্ধারিত থাকে এবং তখনই তা পালন করা হয়ে থাকে এবং তা পালন করার পর মানুষ তা থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এ ইবাদাতটি সর্বক্ষণ জারী থাকে এবং এটিই আল্লাহ ও তাঁর বন্দেগীর সাথে মানুষের জীবনের স্থায়ী সম্পর্ক জুড়ে রাখে। মানুষের মন

কেবলমাত্র এসব বিশেষ কাজের সময়েই নয় বরং সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং তার কন্ঠ সর্বক্ষণ তাঁর স্মরণে সিক্ত থাকলেই এরি মাধ্যমেই ইবাদাত ও অন্যান্য দীনী কাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মানুষের মধ্যে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তার জীবনে ইবাদাত ও দীনী কাজ ঠিক তেমনিভাবে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে যেমন একটি চারাগাছকে তার প্রকৃতির অনুকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হলে তা বেড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে যে জীবন আল্লাহর এ সার্বক্ষণিক স্মরণ শূন্য থাকে সেখানে নিছক বিশেষ সময়ে অথবা বিশেষ সুযোগে অনুষ্ঠিত ইবাদাত ও দীনী কাজের দৃষ্টান্ত এমন একটি চারাগাছের মতো যাকে তার প্রকৃতির প্রতিকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হয় এবং নিছক বাগানের মালির বিশেষ তত্ত্বাবধানের কারণে বেঁচে থাকে। একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

عن معاذبن انس الجهنى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
ان رجلا سأله اى المجاهدين اعظم اجرا يا رسول اللّه ؟ قال
اكثرهم لله تعالى ذكرا - قال اى الصائمين اكثر اجرا ؟ قال
اكثرهم لله عز وجل ذكرا - ثم ذكر الصلوة والزكوة والحج والصدقه
كل ذلك يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اكثرهم لله ذكرا -

"মু'আয ইবনে আনাস জুহানী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! জিহাদকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিদান লাভ করবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে স্মরণ করবে। তিনি নিবেদন করেন, রোযা পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রতিদান পাবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করবে? আবার তিনি একইভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ ও সাদকা আদায়কারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে নবী করীম (সা) বলেন, "যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে।" (মুসনাদে আহমাদ)

৬৪. আল্লাহর দরবারে কোন্ গুণাবলীকে আসল মূল্য ও মর্যাদা দেয়া হয় এ আয়াতে তা বলে দেয়া হয়েছে। এগুলো ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ (Bassic Values)। একটি বাক্যে এগুলোকে একত্র সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। এ মূল্যবোধগুলোর প্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন ফারাক নেই। কাজের ভিত্তিতে নিসন্দেহে উভয় দলের কর্মক্ষেত্র আলাদা। পুরুষদের জীবনের কিছু বিভাগে কাজ করতে হয়। নারীদের কাজ করতে হয় ভিন্ন কিছু বিভাগে। কিন্তু এ গুণাবলী যদি উভয়ের মধ্যে সমান থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে উভয়ের মর্যাদা সমান এবং উভয়ের প্রতিদানও সমান হবে। একজন রান্নাঘর ও গৃহস্থালী সামলালো এবং অন্যজন খেলাফতের মসনদে বসে শরীয়াতের বিধান জারী করলো আবার একজন গৃহে সন্তান লালন–পালন করলো এবং অন্যজন যুদ্ধের ময়দানে

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝٣٦

যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর[৬৫] সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোন অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।[৬৬]

গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করলো—এ জন্যে উভয়ের মর্যাদা ও প্রতিদানে কোন পার্থক্য দেখা দেবে না।

৬৫. হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহ প্রসংগে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল এখান থেকেই তা শুরু হচ্ছে।

৬৬. ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইকরামাহ ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন, এ আয়াত তখন নাযিল হয়েছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদের (রা) জন্য হযরত যয়নবের (রা) সাথে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলেন এবং হযরত যয়নব ও তাঁর আত্মীয়রা তা নামঞ্জুর করেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ পয়গাম দেন তখন হযরত যয়নব (রা) বলেনঃ انا خير منه نسبا "আমি তার চেয়ে উচ্চ বংশীয়া" ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, তিনি জবাবে একথাও বলেছিলেন ঃ لا ارضاه لنفسى وانا ايم قريش "আমি অভিজাত কুরাইশ পরিবারের মেয়ে, তাই আমি তাকে নিজের জন্য পছন্দ করি না।" তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শও (রা) এ ধরনের অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। এর কারণ ছিল এই যে, হযরত যায়েদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদ করা গোলাম ছিলেন এবং হযরত যয়নব ছিলেন তাঁর ফুফু (উমাইমাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব)–এর কন্যা। এত উঁচু ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, তাও আবার যাতা পরিবার নয়, নবীর নিজের ফুফাত বোন এবং তার বিয়ের পয়গাম তিনি দিচ্ছিলেন নিজের আযাদ করা গোলামের সাথে একথা তাদের কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। এ জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত শুনতেই হযরত যয়নব ও তাঁর পরিবারের সবাই নির্দ্বিধায় আনুগত্যের শির নত করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বিয়ে পড়ান। তিনি নিজে হযরত যায়েদের (রা) পক্ষ থেকে ১০ দীনার ও ৬০ দিরহাম মোহরানা আদায় করেন, কনের কাপড় চোপড় দেন এবং কিছু খাবার দাবারের জিনিসপত্র পাঠান।

এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ সময়ে নাযিল হয় কিন্তু এর মধ্যে যে হুকুম বর্ণনা করা হয় তা ইসলামী আইনের একটি বড় মূলনীতি এবং সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

হে নবী![৬৭] স্মরণ করো, যখন আল্লাহ এবং তুমি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে[৬৮] তাকে তুমি বলছিলে, "তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় করো।"[৬৯] সে সময় তুমি তোমার মনের মধ্যে যে কথা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন, তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে।[৭০] তারপর তখন তার ওপর থেকে যায়েদের সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল[৭১] তখন আমি সেই(তালাকপ্রাপ্ত মহিলার) বিয়ে তোমার সাথে দিয়ে দিলাম,[৭২] যাতে মু'মিনদের জন্য তাদের পালকপুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোন প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে যখন তাদের ওপর থেকে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।[৭৩] আর আল্লাহর হুকুম তো কার্যকর হয়েই থাকে।

এটি প্রযুক্ত হয়। এর দৃষ্টিতে যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোন হুকুম প্রমাণিত হয় সে বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তি, জাতি, প্রতিষ্ঠান, আদালত, পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রের নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই। মুসলমান হবার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে নিজের স্বাধীন ইখতিয়ার বিসর্জন দেয়া। কোন ব্যক্তি বা জাতি মুসলমানও হবে আবার নিজের জন্য এ ইখতিয়ারটিও সংরক্ষিত রাখবে। এ দু'টি বিষয় পরস্পর বিরোধী—এ দু'টো কাজ এক সাথে হতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ দু'টি দৃষ্টিভংগীকে একত্র করার ধারণা করতে পারে না। যে ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় তাকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে আনুগত্যের শির নত করতে হবে। আর যে ব্যক্তি শির নত করতে চায় না তাকে সোজাভাবেই মেনে নিতে হবে যে, সে মুসলমান নয়। যদি সে না মানে তাহলে নিজেকে মুসলমান বলে যত জোরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুক না কেন আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের দৃষ্টিতে সে মুনাফিকই গণ্য হবে।

৬৭. এখান থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্তকার বিষয়বস্তু এমন সময় নাযিল হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করে ফেলেছিলেন এবং একে

ভিত্তি করে মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকরা রসূলের বিরুদ্ধে তুমুল অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছিল। এ আয়াতগুলো অধ্যয়ন করার সময় একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। যে শত্রুরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করেই দুর্নাম রটাবার এবং নিজেদের অন্তরজ্বালা মিটাবার জন্য মিথ্যা, অপবাদ, গালমন্দ ও নিন্দাবাদের অভিযান চালাচ্ছিল তাদেরকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে এগুলো বলা হয়নি। বরং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের এ অভিযানের প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করা এবং ছড়ানো সন্দেহ–সংশয় থেকে তাদেরকে সংরক্ষিত রাখা। একথা স্পষ্ট, আল্লাহর কালাম অস্বীকারকারীদেরকে নিশ্চিত করতে পারতো না। এ কালাম যদি কাউকে নিশ্চিন্ত করতে পারতো, তাহলে তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা একে আল্লাহর কালাম বলে জানতো এবং সে হিসেবে একে মেনে চলতো। শত্রুদের এসব আপত্তি কোনভাবে তাদের মনেও সন্দেহ–সংশয় এবং তাদের মস্তিষ্কেও জটিলতা ও সংকট সৃষ্টিতে সক্ষম না হয়ে পড়ে, আল্লাহর এ বান্দাদের সম্পর্কে তখন এ আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই আল্লাহ একদিকে সম্ভাব্য সকল সন্দেহ নিরসন করেছেন অন্যদিকে মুসলমানদেরকেও এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ ধরনের অবস্থায় তাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা জানিয়ে দিয়েছেন।

৬৮. এখানে যায়েদের (রা) কথা বলা হয়েছে। সামনের দিকে একথাটি সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কি ছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহ কি ছিল? এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য এখানে সংক্ষেপে তাঁর কাহিনীটি বর্ণনা করে দেয়া জরুরী মনে করছি। তিনি ছিলেন আসলে কালব গোত্রের হারেসা ইবনে শারাহীল নামক এক ব্যক্তির পুত্র। তাঁর মাতা সু'দা বিনতে সা'লাবা ছিলেন তাঈ গোত্রের বনী মা'ন শাখার মেয়ে। তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর মা তাঁকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান। সেখানে বনী কাইন ইবনে জাস্‌রের লোকেরা তাদের লোকালয় আক্রমণ করে এবং লুটপাট করে যেসব লোককে নিজেদের সাথে পাকড়াও করে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে হযরত যায়েদও ছিলেন। তারা তায়েফের নিকটবর্তী উকাযের মেলায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিক্রি করে দেয়। হযরত খাদীজার (রা) ভাতিজা হাকিম ইবনে হিযাম তাঁকে কিনে নিয়ে যান। তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে এসে নিজের ফুফুর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত খাদীজার (রা) যখন বিয়ে হয় তখন নবী করীম (সা) তাঁর কাছে যায়েদকে দেখেন এবং তাঁর চালচলন ও আদব কায়দা তাঁর এত বেশী পছন্দ হয়ে যায় যে, তিনি হযরত খাদীজার (রা) কাছ থেকে তাঁকে চেয়ে নেন। এভাবে এই সৌভাগ্যবান ছেলেটি সৃষ্টির সেরা এমন এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে যান যাঁকে কয়েক বছর পরেই মহান আল্লাহ নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত যায়েদের (রা) বয়স ছিল ১৫ বছর। কিছুকাল পরে তাঁর বাপ চাচা জানতে পারেন তাদের ছেলে মক্কায় আছে। তারা তাঁর খোঁজ করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে যান। তারা বলেন, আপনি মুক্তিপণ হিসেবে যা নিতে চান বলুন আমরা তা আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাদের সন্তান আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। নবী করীম (সা) বলেন, আমি ছেলেকে ডেকে আনছি এবং তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, সে চাইলে আপনাদের সাথে চলে যেতে পারে এবং চাইলে আমার কাছে থাকতে পারে। যদি সে আপনাদের সাথে চলে যেতে চায়

তাহলে আমি এর বিনিময়ে মুক্তিপণ হিসেবে কোন অর্থ নেবো না এবং তাকে এমনিই ছেড়ে দেবো। আর যদি সে আমার কাছে থাকতে চায় তাহলে আমি এমন লোক নই যে, কেউ আমার কাছে থাকতে চাইলে আমি তাকে খামখা তাড়িয়ে দেবো। জবাবে তারা বলেন, আপনি যে কথা বলেছেন তাতো ইনসাফেরও অতিরিক্ত। আপনি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নিন। নবী করীম (সা) যায়েদকে ডেকে আনেন এবং তাঁকে বলেন, এই দু'জন ভদ্রলোককে চেনো? যায়েদ জবাব দেন, জি হাঁ, ইনি আমার পিতা এবং ইনি আমার চাচা। তিনি বলেন, আচ্ছা, তুমি এদেরকেও জানো এবং আমাকেও জানো। এখন তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তুমি চাইলে এদের সাথে চলে যেতে পারো এবং চাইলে আমার সাথে থেকে যাও। তিনি জবাব দেন, আমি আপনাকে ছেড়ে কারো কাছে যেতে চাই না। তাঁর বাপ ও চাচা বলেন, যায়েদ, তুমি কি স্বাধীনতার ওপর দাসত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছো এবং নিজের মা-বাপ ও পরিবার পরিজনকে ছেড়ে অন্যদের কাছে থাকতে চাও? তিনি জবাব দেন, আমি এ ব্যক্তির যে গুণাবলী দেখেছি তার অভিজ্ঞতা লাভ করার পর এখন আর দুনিয়ার কাউকেও তাঁর ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না। যায়েদের এ জবাব শুনে তার বাপ ও চাচা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে রেখে যেতে রাজি হয়ে যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনই যায়েদকে আযাদ করে দেন এবং হারাম শরীফে গিয়ে কুরাইশদের সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা করেন, আপনারা সবাই সাক্ষী থাকেন আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হবো। এ কারণে লোকেরা তাঁকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলতে থাকে। এসব নবুওয়াতের পূর্বের ঘটনা। তারপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তখন চারজন এমন ছিলেন যারা এক মুহূর্তের জন্যও কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই তাঁর মুখে নবুওয়াতের দাবী শুনতেই তাঁকে নবী বলে মেনে নেন। তাদের একজন হযরত খাদীজা (রা), দ্বিতীয়জন হযরত যায়েদ (রা), তৃতীয় জন হযরত আলী (রা) এবং চতুর্থজন হযরত আবু বকর (রা)। এ সময় হযরত যায়েদের (রা) বয়স ছিল ৩০ বছর এবং নবী করীমের (সা) সাথে তার ১৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। হিজরাতের পরে ৪ হিজরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ফুফাত বোনের সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন। নিজের পক্ষ থেকে তার মোহরানা আদায় করেন এবং ঘর-সংসার গুছিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও দেন।

এ অবস্থার প্রতিই মহান আল্লাহ তাঁর "যার প্রতি আল্লাহ ও তুমি অনুগ্রহ করেছিলে" বাক্যাংশের মধ্যে ইশারা করেছেন।

৬৯. এটা সে সময়ের কথা যখন হযরত যায়েদ (রা) ও হযরত যয়নবের (রা) সম্পর্ক তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তিনি বারবার অভিযোগ করার পর শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করেন, আমি তাকে তালাক দিতে চাই। হযরত যয়নব (রা) যদিও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম মেনে নিয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান কিন্তু নিজের মন থেকে এ অনুভূতিটি তিনি কখনো মুছে ফেলতে পারেননি যে, যায়েদ একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, তাদের নিজেদের পরিবারের অনুগ্রহে লালিত এবং তিনি নিজে আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের একজন নিম্নমানের লোকের সাথে তার বিয়ে দেয়া হয়েছে। এ অনুভূতির কারণে

দাম্পত্য জীবনে তিনি কখনো হযরত যায়েদকে নিজের সমকক্ষ ভাবেননি। এ কারণে উভয়ের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে যেতে থাকে। এক বছরের কিছু বেশী দিন অতিবাহিত হতে না হতেই অবস্থা তালাক দেয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৭০. কেউ কেউ এ বাক্যটির উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছেন এভাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁর মন চাচ্ছিল হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দিক। কিন্তু যখন যায়েদ (রা) এসে বললেন, আমি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই তখন তিনি নাউযুবিল্লাহ আসল কথা মনের মধ্যে চেপে রেখে কেবলমাত্র মুখেই তাঁকে নিষেধ করলেন। একথায় আল্লাহ বলছেন, "তুমি মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রাখছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন।" অথচ আসল ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ উল্টো। যদি এ সূরার ১, ২, ৩ ও ৭ আয়াতের সাথে এ বাক্যটি মিলিয়ে পড়া হয়, তাহলে পরিষ্কার অনুভূত হবে যে, হযরত যায়েদ ও তার স্ত্রীর মধ্যে যে সময় তিক্ততা বেড়ে যাচ্ছিল সে সময়ই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে ইংগিত দিয়েছিলেন যে, যায়েদ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে তখন তোমাকে তার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু যেহেতু আরবের সে সমাজে পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার অর্থ কি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন এবং তাও এমন এক অবস্থায় যখন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মুসলমান ছাড়া বাকি সমগ্র আরব দেশ তাঁর বিরুদ্ধে ধনুকভাঙাপণ করে বসেছিল—এ অবস্থায় তিনি এ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে ইতস্তত করছিলেন। এ কারণে হযরত যায়েদ (রা) যখন স্ত্রীকে তালাক দেবার সংকল্প প্রকাশ করেন তখন নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ো না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যায়েদ যদি তালাক না দেন, তাহলে তিনি এ বিপদের মুখোমুখি হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। নয়তো যায়েদ তালাক দিলেই তাঁকে হুকুম পালন করতে হবে এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় ও অপপ্রচারের ভয়াবহ তুফান সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে উচ্চ মনোবল, দৃঢ় সংকল্প ও আল্লাহর ফায়সালায় রাজি থাকার যে উচ্চ মর্যাদার আসনে দেখতে চাচ্ছিলেন সে দৃষ্টিতে নবী করীমের (সা) ইচ্ছা করে যায়েদকে তালাক থেকে বিরত রাখা নিম্নমানের কাজ বিবেচিত হয়। তিনি আসলে ভাবছিলেন যে, এর ফলে তিনি এমন কাজ করা থেকে বেঁচে যাবেন যাতে তাঁর দুর্নামের আশংকা ছিল। অথচ আল্লাহ একটি বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে দিয়ে সে কাজটি করাতে চাচ্ছিলেন। "তুমি লোকভয় করছো অথচ আল্লাহকে ভয় করাই অধিকতর সংগত"—এ কথাগুলো পরিষ্কারভাবে এ বিষয়বস্তুর দিকে ইংগিত করছে।

ইমাম যয়নুল আবেদীন হযরত আলী ইবনে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাই বলেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে খবর দিয়েছিলেন যে, যয়নব (রা) আপনার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হতে যাচ্ছেন। কিন্তু যায়েদ (রা) যখন এসে তাঁর কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করো না। একথায় আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি তোমাকে যয়নবের সাথে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি অথচ তুমি যায়েদের সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ যেকথা প্রকাশ করতে

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

নবীর জন্য এমন কোন কাজে কোন বাধা নেই যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করেছেন[৭৪] ইতিপূর্বে যেসব নবী অতীত হয়ে গেছেন তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল আল্লাহর নিয়ম, আর আল্লাহর হুকুম হয় একটি চূড়ান্ত স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত।[৭৫] (এ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম তাদের জন্য) যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে থাকে, তাঁকেই ভয় করে এবং এক আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না আর হিসেব গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট।[৭৬]

(হে লোকেরা!) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নয় কিন্তু সে আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী আর আল্লাহ সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।[৭৭]

চান তা গোপন করছিলে। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে)

আল্লামা আলূসীও তাফসীর রূহুল মা'আনীতে এর একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "এটি হচ্ছে শ্রেয়তর কাজ পরিত্যাগ করার জন্য ক্রোধ প্রকাশ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চুপ থাকতেন অথবা যায়েদকে (রা) বলতেন, তুমি যা চাও করতে পারো, এ অবস্থায় এটিই ছিল শ্রেয়তর। অভিব্যক্ত ক্রোধের সারৎসার হচ্ছে ঃ তুমি কেন যায়েদকে বললে তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না।? অথচ আমি তোমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি যে, যয়নব তোমার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হবে।"

৭১. অর্থাৎ যায়েদ (রা) যখন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং তাঁর ইদ্দত পুরা হয়ে গেলো। "প্রয়োজন পূর্ণ করলো" শব্দগুলো স্বতস্ফূর্তভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, তাঁর কাছে যায়েদের আর কোন প্রয়োজন থাকলো না। কেবলমাত্র তালাক দিলেই এ অবস্থাটির সৃষ্টি হয় না। কারণ স্বামীর আর কোন আকর্ষণ থেকে গেলে ইদ্দতের মাঝখানে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। আর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার কথা জানতে পারার মধ্যেও স্বামীর প্রয়োজন থেকে যায়। তাই যখন ইদ্দত খতম হয়ে যায় একমাত্র তখনই তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

৭২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই নিজের ইচ্ছায় এ বিয়ে করেননি বরং আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে করেন, এ ব্যাপারে এ শব্দগুলো একেবারেই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

৭৩. এ শব্দগুলো একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে যে, আল্লাহ এ কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এমন একটি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য করিয়েছিলেন যা এ পদ্ধতিতে ছাড়া অন্য কোনভাবে সম্পাদিত হতে পারতো না। আরবে পালক পুত্রদের সম্পর্কিত আত্মীয়তার ব্যাপারে যে সমস্ত ভ্রান্ত রসম-রেওয়াজের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর রসূল নিজে অগ্রসর হয়ে না ভাঙলে সেগুলো ভেঙে ফেলার ও উচ্ছেদ করার আর কোন পথ ছিল না। কাজেই আল্লাহ নিছক নবীর গৃহে আর একজন স্ত্রী বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এ বিয়ে করিয়েছিলেন।

৭৪. এ শব্দগুলো থেকে একথা পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয় যে, অন্য মুসলমানদের জন্য তো এ ধরনের বিয়ে নিছক মুবাহ তথা অনুমোদিত কাজ কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এটি ছিল একটি ফরয এবং এ ফরয আল্লাহ তাঁর প্রতি আরোপ করেছিলেন।

৭৫. অর্থাৎ নবীদের জন্য চিরকাল এ বিধান নির্ধারিত রয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হুকুমই আসে তা কার্যকর করা তাঁদের জন্য স্থিরীকৃত কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে বিরত থাকার কোন অবকাশ তাদের জন্য নেই। যখন আল্লাহ নিজের নবীর ওপর কোন কাজ ফরয করে দেন তখন সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগলেও তাঁকে সে কাজ করতেই হয়।

৭৬. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, كفى بالله حسيبا এর দু'টি অর্থ। এক, প্রত্যেকটি ভয় ও বিপদের মোকাবিলায় আল্লাহই যথেষ্ট। দুই, হিসেব নেবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তাঁর ছাড়া আর কারো কাছে জবাবদিহির ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই।

৭৭. বিরোধীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উঠাচ্ছিল এ একটি বাক্যের মাধ্যমে সেসবের মূলোচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে।

তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের পুত্রবধুকে বিয়ে করেন, অথচ তাঁর নিজের শরীয়াতেও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্য হারাম। এর জবাবে বলা হয়েছে, "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হয়েছে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্রই ছিলেন না, কাজেই তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হবে কেন? তোমরা নিজেরাই জানো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদতে কোন পুত্র সন্তানই নেই।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল, ঠিক আছে, পালক পুত্র যদি আসল পুত্র না হয়ে থাকে তাহলেও তার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা বড় জোর বৈধই হতে পারতো কিন্তু তাকে বিয়ে করার এমন কি প্রয়োজন ছিল? এর জবাবে বলা হয়েছে, "কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল।" অর্থাৎ রসূল হবার কারণে তাঁর ওপর এ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছিল যে, তোমাদের রসম-রেওয়াজ যে হালাল জিনিসটিকে অযথা হারাম গণ্য করে রেখেছে

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَـٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَـٰمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করো এবং সকাল সাঁঝে তাঁর মহিমা ঘোষণা করতে থাকো।[৭৮] *তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আসেন, তিনি মু'মিনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।*[৭৯] *যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, তাদের অভ্যর্থনা হবে সালামের মাধ্যমে*[৮০] *এবং তাদের জন্য আল্লাহ বড়ই সম্মানজনক প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।*

সে ব্যাপারে সকল রকমের স্বার্থপ্রীতির তিনি অবসান ঘটিয়ে দেবেন এবং তার হালাল হবার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ–সংশয়ের অবকাশই রাখবে না।

আবার অতিরিক্ত তাকিদ সহকারে বলা হয়েছে, "এবং তিনি শেষ নবী।" অর্থাৎ যদি কোন আইন ও সামাজিক সংস্কার তাঁর আমলে প্রবর্তিত না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পরে আগমনকারী নবী তার প্রবর্তন করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পরে আর কোন রসূল তো দূরের কথা কোন নবীই আসবেন না। কাজেই তিনি নিজেই জাহেলিয়াতের এ রসমটির মূলোচ্ছেদ করে যাবেন, এটা আরো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

এরপর আরো বেশী জোর দিয়ে বলা হয়েছে, "আল্লাহ প্রত্যেকটি বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।" অর্থাৎ আল্লাহ জানেন, এ সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের এ রসমটির মূলোচ্ছেদ করা কেন জরুরী ছিল এবং এমনটি না করলে কি মহা অনর্থ হতো। তিনি জানেন, এখন আর তাঁর পক্ষ থেকে কোন নবী আসবেন না, কাজেই নিজের শেষ নবীর মাধ্যমে এখন যদি তিনি এ রসমটিকে উৎখাত না করেন তাহলে এমন দ্বিতীয় আর কোন সত্তাই নেই যিনি এটি ভঙ্গ করলে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্য থেকে চিরকালের জন্য এটি মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। পরবর্তী সংস্কারকগণ যদি এটি ভাঙেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কারো কর্মও তাঁর ইন্তিকালের পরে এমন কোন বিশ্বজনীন ও চিরন্তন কর্তৃত্বের অধিকারী হবে না যার ফলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক যুগের লোকেরা তার অনুসরণ করতে থাকবে এবং তাদের মধ্য থেকে কারো ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নিজের মধ্যে এমন কোন পবিত্রতার বাহন হবে না যার ফলে তাঁর

কোন কাজ নিছক তাঁর সুন্নাত হবার কারণে মানুষের মন থেকে অপছন্দনীয়তার সকল প্রকার ধারণার মূলোচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে।

দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগের একটি দল এ আয়াতটি ভুল ব্যাখ্যা করে একটি বড় ফিত্‌নার দরোজা খুলে দিয়েছে, তাই 'খতমে নবুওয়াত' বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং এ দলটির ছড়ানো বিভ্রান্তিগুলো নিরসনের জন্য আমি এ সূরার তাফসীরের শেষে একটি বিস্তারিত পরিশিষ্ট সংযোজন করে দিয়েছি।

৭৮. মুসলমানদেরকে এ উপদেশ দেয়াই এর উদ্দেশ্য যে, যখন শত্রুদের পক্ষ থেকে আল্লাহর রসূলের প্রতি ব্যাপকভাবে বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদ করা হয় এবং আল্লাহর সত্য দীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য রসূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তুফান সৃষ্টি করা হয় তখন নিশ্চিন্তে এসব বাজে খিস্তি খেউড় শুনতে থাকা, নিজেই শত্রুদের ছড়ানো সন্দেহ সংশয়ে জড়িয়ে পড়া এবং জবাবে তাদেরকেও গালাগালি করতে থাকা মু'মিনদের কাজ নয়। বরং তাদের কাজ হচ্ছে, সাধারণ দিনগুলোর তুলনায় এসব দিনে বিশেষভাবে আল্লাহকে আরো বেশী করে স্মরণ করা। "আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করা"র অর্থ ৬৩ টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে। সকাল সাঁঝে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে সর্বক্ষণ তাঁর তাসবীহ করা। আর তাসবীহ করা মানে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, নিছক তাসবীহর দানা হাতে নিয়ে গুণতে থাকা নয়।

৭৯. মুসলমানদের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য যে, কাফের ও মুনাফিকদের মনের সমস্ত জ্বালা ও আক্রোশের কারণ হচ্ছে আল্লাহর রহমত, যা তাঁর রসূলের বদৌলতে তোমাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে। এরি মাধ্যমে তোমরা ঈমানী সম্পদ লাভ করেছো, কুফরী ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার ভেদ করে ইসলামের আলোকে চলে এসেছো এবং তোমাদের মধ্যে এমন উন্নত নৈতিক বৃত্তি ও গুণাবলীর সৃষ্টি হয়েছে যেগুলোর কারণে অন্যদের থেকে তোমাদের সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হচ্ছে। হিংসুটেরা রসূলের ওপর এরি ঝাল ঝাড়ছে। এ অবস্থায় এমন কোন নীতি অবলম্বন করো না যার ফলে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাও।

অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করার জন্য মূলে সালাত (يصلى-صلوة) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সালাত' শব্দটি যখন আলা (على) অব্যয় (Preposition) সহকারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় রহমত, অনুগ্রহ, করুণা ও স্নেহাশীষ। আর যখন এটি ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় রহমতের দোয়া করা। অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য এই মর্মে দোয়া করে যে, হে আল্লাহ, তুমি এদের প্রতি অনুগ্রহ করো এবং তোমার দানে এদেরকে আপ্লুত করে দাও। এভাবে يُصَلِّى عَلَيْكُم এর অর্থ এও হয় যে, يشيع عنكم الذكر الجميل فى عباد الله অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে তোমাদেরকে খ্যাতি দান করেন এবং এমন পর্যায়ে উন্নীত করেন যার ফলে আল্লাহর সমুদয় সৃষ্টি তোমাদের প্রশংসা করতে থাকে এবং ফেরেশতারা তোমাদের প্রশংসা ও সুনামের আলোচনা করতে থাকে।

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

হে নবী![৮১] আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে,[৮২] সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে[৮৩] আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে[৮৪] এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে (তোমার প্রতি) যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ। আর কখনো দমিত হয়ো না কাফের ও মুনাফিকদের কাছে, পরোয়া করো না তাদের পীড়নের এবং ভরসা করো আল্লাহর প্রতি। আল্লাহই যথেষ্ট এ জন্য যে, মানুষ তাঁর হাতে তার যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করে দেবে।

৮০. মূলে বলা হয়েছে ঃ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ "তার সাথে মোলাকাতের সময় সেদিন তাদের অভ্যর্থনা হবে সালাম" এর তিনিটি অর্থ হতে পারে। এক, আল্লাহ নিজেই "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলে তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেন। যেমন সূরা ইয়াসীন–এর ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

দুই, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করবে। যেমন সূরা নাহ্‌লে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ –

"ফেরেশতারা যাদের রূহ কব্‌য করবে এমন অবস্থায় যখন তারা পবিত্র লোক ছিল, তাদেরকে তারা বলবে, শান্তি ও নিরাপত্তা হোক তোমাদের প্রতি, প্রবেশ করো জান্নাতে তোমাদের সৎকাজসমূহের বদৌলতে, যা তোমরা দুনিয়ায় করতে।"

(৩২ আয়াত)

তিন, তারা নিজেরাই পরস্পরকে সালাম করবে। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –

"সেখানে তাদের আওয়াজ হবে, হে আল্লাহ! পবিত্র তোমার সত্তা, তাদের অভ্যর্থনা হবে 'সালাম' এবং তাদের কথা শেষ হবে এ বাক্য দিয়ে যে,. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যই।" (১০ আয়াত)

৮১. মুসলমানদেরকে উপদেশ দেবার পর এবার আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে কয়েকটা সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেছেন। বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ আপনাকে আমি এসব উন্নত মর্যাদা দান করেছি। এ বিরোধীরা অপবাদ ও মিথ্যাচারের তুফান সৃষ্টি করে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ আপনার ব্যক্তিত্ব তার অনেক উর্ধে। কাজেই আপনি তাদের শয়তানির কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত হবেন না এবং তাদের প্রচারণাকে তিলার্ধও গুরুত্ব দেবেন না। নিজের আরোপিত দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন এবং তাদের মনে যা চায় তাই বকবক করতে বলুন। এ সংগে পরোক্ষভাবে মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সকল মানুষকে বলা হয়েছে যে, কোন সাধারণ মানুষের সাথে তাদের মোকাবিলা হচ্ছে না বরং মহান আল্লাহ যাঁকে মর্যাদার উচ্চমার্গে পৌছিয়ে দিয়েছেন তেমনি এক মহান ব্যক্তিত্বের সাথে হচ্ছে তাদের মোকাবিলা।

৮২. নবীকে সাক্ষী করার ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। তিন ধরনের সাক্ষ প্রদান এর অন্তরভুক্ত ঃ

এক ঃ মৌখিক সাক্ষদান। অর্থাৎ আল্লাহর দীন যেসব সত্য ও মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নবী তার সত্যতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং দুনিয়াবাসীকে পরিষ্কার বলে দেবেন, এটিই সত্য এবং এর বিরুদ্ধে যা কিছু আছে সবই মিথ্যা। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, অহী নাযিল হওয়া, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অনিবার্যতা এবং জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকাশ, দুনিয়াবাসীদের কাছে যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন এবং তারা একথাগুলোর বক্তাকে যতই বিদ্রূপ করুক বা তাকে পাগল বলুক না কেন, নবী কারো পরোয়া না করেই দাঁড়িয়ে যাবেন এবং সোচ্চার কণ্ঠে বলে দেবেন, এসব কিছুই সত্য এবং যারা এসব মানে না তারা পথভ্রষ্ট। এভাবে নৈতিকতা ও সভ্যতা–সংস্কৃতির যে ধারণা, মূল্যবোধ, মূলনীতি ও বিধান আল্লাহ তাঁর সামনে সুস্পষ্ট করেছেন সেগুলোকে সারা দুনিয়ার মানুষ মিথ্যা বললেও এবং তারা তার বিপরীত পথে চললেও নবীর কাজ হচ্ছে সেগুলোকেই প্রকাশ্য জনসমক্ষে পেশ করবেন এবং দুনিয়ায় প্রচলিত তার বিরোধী যাবতীয় পদ্ধতিকে ভ্রান্ত ঘোষণা করবেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর শরীয়াতে যা কিছু হালাল সারা দুনিয়া তাকে হারাম মনে করলেও নবী তাকে হালালই বলবেন। আর আল্লাহর শরীয়াতে যা হারাম সারা দুনিয়া তাকে হালাল ও ভালো গণ্য করলেও নবী তাকে হারামই বলবেন।

দুই ঃ কর্মের সাক্ষ। অর্থাৎ দুনিয়ার সামনে যে মতবাদ পেশ করার জন্য নবীর আবির্ভাব হয়েছে তিনি নিজের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার প্রদর্শনী করবেন। যে জিনিসকে তিনি মন্দ বলেন তাঁর জীবন তার সকল প্রকার গন্ধমুক্ত হবে।" যে জিনিসকে তিনি ভালো বলেন তাঁর চরিত্রে তা পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান হবে। যে জিনিসকে তিনি ফরয বলেন তা পালন করার ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে অগ্রণী হবেন। যে জিনিসকে তিনি গোনাহ বলেন তা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে কেউ তাঁর সমান হবে না। যে জীবন বিধানকে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান বলেন তাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রচেষ্টার

ত্রুটি করবেন না। তিনি নিজের দাওয়াতের ব্যাপারে কতটা সত্যনিষ্ঠ ও আন্তরিকতা তাঁর নিজের চরিত্র ও কার্যধারাই সাক্ষ দেবে। তাঁর সত্তা তাঁর শিক্ষার এমন মূর্তিমান আদর্শ হবে, যা দেখে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, যে দীনের দিকে তিনি দুনিয়াবাসীকে আহবান জানাচ্ছেন তা কোন্ মানের মানুষ তৈরি করতে চায়, কোন্ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি তার লক্ষ্য এবং তার সাহায্যে সে কোন্ ধরনের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করে।

তিন ঃ পরকালীন সাক্ষ। অর্থাৎ আখেরাতে যখন আল্লাহর আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে তখন নবী এ মর্মে সাক্ষ দেবেন, তাঁকে যে পয়গাম দেয়া হয়েছিল তা তিনি কোন প্রকার কাটছাঁট ও কমবেশী না করে হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সামনে নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটি করেননি। এ সাক্ষের ভিত্তিতে তাঁর বাণী মান্যকারী কি পুরস্কার পাবে এবং অমান্যকারী কোন্ ধরনের শাস্তির অধিকারী হবে তার ফায়সালা করা হবে।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষদানের পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাঁর প্রতি কত বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং এত উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কত মহান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। একথা স্পষ্ট, কথা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সত্য দীনের সাক্ষ প্রদান করার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিল পরিমাণও ত্রুটি হয়নি। তবেই তো তিনি আখেরাতে এই মর্মে সাক্ষ দিতে পারবেন, "আমি লোকদের সামনে সত্যকে পুরোপুরি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলাম।" আর তবেই তো আল্লাহর প্রমাণ (হুজ্জাত) লোকদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অন্যথায় যদি সাক্ষ দেবার ব্যাপারে এখানে নাউযুবিল্লাহ তাঁর কোন ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে না তিনি আখেরাতে তাদের জন্য সাক্ষী হতে পারবেন আর না সত্য অমান্যকারীদের অপরাধ সত্য প্রমাণিত হতে পারবে।

কেউ কেউ এ সাক্ষদানকে এ অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতে লোকদের কাজের ওপর সাক্ষ দেবেন এবং এ থেকে তারা একথা প্রমাণ করেন যে, নবী করীম (সা) সকল মানুষের কার্যক্রম দেখছেন অন্যথায় না দেখে কেমন করে সাক্ষ দিতে পারবেন? কিন্তু কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে এ ব্যাখ্যা একেবারেই ভ্রান্ত। কুরআন আমাদের বলে, লোকদের কার্যক্রমের ওপর সাক্ষ কায়েম করার জন্য তো আল্লাহ অন্য একটি ব্যবস্থা করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁর ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা তৈরি করছে। (দেখুন সূরা কাফ ১৭-১৮ আয়াত এবং আল কাহ্ফ ১৪৯ আয়াত) আর এ জন্য তিনি মানুষের নিজের অংগ-প্রত্যংগেরও সাক্ষ নেবেন। (সূরা ইয়াসীন, ৬৫; হা মীম আস্ সাজদাহ, ২০-২১) বাকী রইলো নবীগণের ব্যাপার। আসলে নবীগণের কাজ বান্দাদের কার্যক্রমের ওপর সাক্ষ দেয়া নয় বরং বান্দাদের কাছে যে সত্য পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে তাঁরা সাক্ষ দেবেন। কুরআন পরিষ্কার বলে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۖ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ٥

"যেদিন আল্লাহ সমস্ত রসূলকে সমবেত করবেন তারপর জিজ্ঞেস করবেন; তোমাদের দাওয়াতের কি জবাব দেয়া হয়েছিল? তখন তারা বলবে, আমাদের কিছুই জানা নেই। সমস্ত অজ্ঞাত ও অজানা কথাতো একমাত্র তুমিই জানো।" (আল মা–য়েদাহ, ১০৯)

আর এ প্রসংগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআন বলে, যখন তাঁকে ঈসায়ীদের গোমরাহী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তখন তিনি বলবেন ঃ

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط

"আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।" (আল মা–য়েদাহ, ১১৭)

নবীগণ যে মানুষের কাজের ব্যাপারে সাক্ষী হবেন না এ সম্পর্কে এ আয়াতটি একেবারেই সুস্পষ্ট। তাহলে তাঁরা সাক্ষী হবেন কোন্ জিনিসের? এর পরিষ্কার জবাব কুরআন এভাবে দিয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

"আর হে মুসলমানগণ! এভাবে আমি তোমাদেরকে করেছি একটি মধ্যপন্থী উম্মাত, যাতে তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে এবং রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন।" (আল বাকারাহ, ১৪৩)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ ط

"আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সাক্ষী উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো, যে তাদের ওপর সাক্ষ দেবে এবং (হে মুহাম্মাদ) তোমাকে এদের ওপর সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসবো।" (আন নাহ্ল, ৮৯)

এ থেকে জানা যায় কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে এবং প্রত্যেক উম্মাতের ওপর সাক্ষদানকারী সাক্ষীদেরকে যে ধরনের সাক্ষদান করার জন্য ডাকা হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষ তা থেকে ভিন্ন ধরনের হবে না। একথা সুস্পষ্ট যে, এটা যদি কার্যাবলীর সাক্ষদান হয়ে থাকে, তাহলে সে সবের উপস্থিত ও দৃশ্যমান হওয়াও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আর মানুষের কাছে তার স্রষ্টার পয়গাম পৌঁছে গিয়েছিল কিনা কেবল এ বিষয়ের সাক্ষ দেয়ার জন্য যদি এ সাক্ষীদেরকে ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যই নবী করীমকে (সা)ও এ উদ্দেশ্যেই পেশ করা হবে।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ প্রমুখগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবুদ দারদা, আনাস ইবনে মালেক ও অন্যান্য বহু সাহাবা থেকে যে হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোও এ বিষয়বস্তুর সমর্থক। সেগুলোর সম্মিলিত বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন দেখবেন তাঁর কিছু সাহাবীকে আনা হচ্ছে কিন্তু তারা তাঁর দিকে না এসে অন্যদিকে যাচ্ছে অথবা তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। নবী করীম (সা) তাদেরকে দেখে নিবেদন করবেন, হে আল্লাহ! এরা তো আমার সাহাবী। একথায় আল্লাহ বলবেন, তুমি জানো না তোমার পর এরা কি সব কাজ করেছে। এ বিষয়বস্তুটি এত বিপুল সংখ্যক সাহাবী থেকে এত বিপুল সংখ্যক সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, এর নির্ভুলতায় সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। আর এ থেকে একথাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তার প্রত্যেকটি কাজের দর্শক মোটেই নন। তবে যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, নবী (সা)–এর সামনে তাঁর উম্মাতের কার্যাবলী পেশ করা হয়ে থাকে সেটি কোনক্রমেই এর সাথে সংঘর্ষশীল নয়। কারণ তার মূল বক্তব্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, মহান আল্লাহ নবী করীমকে (সা) তাঁর উম্মাতের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখেন। তার এ অর্থ কোথা থেকে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকলাপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছেন?

৮৩. এখানে এ পার্থক্যটা সামনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঈমান ও সৎকাজের জন্য শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেয়া এবং কুফরী ও অসৎকাজের অশুভ পরিণামের ভয় দেখানো এক কথা এবং কারো আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হয়ে প্রেরিত হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা কথা। যে ব্যক্তিই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পদে নিযুক্ত হবেন তাঁর নিজের সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনের পেছনে অবশ্যই কিছু ক্ষমতা থাকে, যার ভিত্তিতে তার সুসংবাদ ও সতর্কীকরণগুলো আইনের মর্যাদা লাভ করে। তার কোন কাজের সুসংবাদ দেয়ার অর্থ হয়, যে সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন শাসকের পথ থেকে তিনি প্রেরিত হয়েছেন তিনি এ কাজটি পছন্দনীয় ও প্রতিদান লাভের যোগ্য বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। কাজেই তা নিশ্চয়ই ফরয বা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব এবং কাজটি যিনি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই প্রতিদান লাভ করবেন। আর তার কোন কাজের অশুভ পরিণামের খবর দেয়ার অর্থ হয়, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সত্তা সে কাজ করতে নিষেধ করছেন, কাজেই তা অবশ্যই হারাম ও গোনাহের কাজ এবং নিশ্চিতভাবেই সে কার্য সম্পাদনকারী শাস্তি লাভ করবে। কোন অনিয়োগকৃত সতর্ককারী ও সুসংবাদ দানকারী কখনো এ মর্যাদা লাভ করবে না।

৮৪. এখানেও একজন সাধারণ প্রচারকের প্রচার ও নবীর প্রচারের মধ্যেও সেই একই পার্থক্য রয়েছে যেদিকে ওপরে ইংগিত করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রচারকই আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং দিতে পারেন কিন্তু তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হন না। পক্ষান্তরে নবী আল্লাহর হুকুমে (Sanction) দাওয়াত দিতে এগিয়ে যান। তাঁর দাওয়াত নিছক প্রচার নয় বরং তার পেছনেও থাকে তাঁর প্রেরক রবুল আলামীনের শাসন কর্তৃত্বের ক্ষমতা। তাই আল্লাহ প্রেরিত আহবায়কের বিরোধিতা স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে গণ্য হয়। দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রের সরকারী কার্যসম্পাদনকারী সরকারী কর্মচারীকে বাধা দেয়া যেমন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মনে করা হয় এও ঠিক তেমনি।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে করো এবং তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দাও[৮৫] তখন তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোন ইদ্দত অপরিহার্য নয়, যা পুরা হবার দাবী তোমরা করতে পারো। কাজেই তাদেরকে কিছু অর্থ দাও এবং ভালোভাবে বিদায় করো।[৮৬]

৮৫. এ বাক্যটিতে একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে 'নিকাহ' তথা বিবাহ শব্দটি থেকে শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনের কথাই প্রকাশ হয়েছে। আরবী ভাষায় 'নিকাহ' শব্দটির আসল অর্থ কি অভিধানবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে বহুতর মতবিরোধ দেখা গেছে। একটি দল বলে, এ শব্দটির মধ্যে শাব্দিকভাবে সংগম ও বিয়ে উভয় অর্থই রয়েছে। অন্য একটি দল বলে, এর মধ্যে সংগম ও বিয়ে উভয় অর্থ প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। তৃতীয় একটি দল বলে, এর আসল অর্থ হচ্ছে এক জোড়া মানব মানবীর বিবাহ এবং সংগমের জন্য একে রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ দলটি বলে, এর আসল অর্থ হচ্ছে সংগম এবং বিয়ের জন্য একে রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এর প্রমাণ হিসেবে প্রত্যেক দল আরবীয় প্রবাদ ও বাগধারা থেকে দৃষ্টান্ত পেশ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাগেব ইস্ফাহানী অত্যন্ত জোরের সাথে দাবী করেছেন ঃ

اصل النكاح العقد ثم استعير للجماع ومحال ان يكون فى الاصل للجماع ثم استعير للعقد

"নিকাহ শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে বিয়ে, তারপর এ শব্দটিকে রূপক অর্থে সহবাসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটা একেবারেই অসম্ভব যে, এর আসল অর্থ হবে সহবাস এবং একে রূপক অর্থে বিয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।"

এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, আরবী ভাষায় বা দুনিয়ার অন্যান্য ভাষায় সহবাস–এর জন্য প্রকৃতপক্ষে যতগুলো শব্দ তৈরি করা হয়েছে তা সবই অশ্লীল। কোন রুচিশীল ব্যক্তি কোন ভদ্র মজলিসে সেগুলো মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করেন না। এখন যে শব্দটিকে প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে মানুষের সমাজ তাকে বিয়ের জন্য রূপক হিসেবে ব্যবহার করবে, এটা কেমন করে সম্ভব? এ অর্থটি প্রকাশ করার জন্য তো প্রত্যেক ভাষায় রুচিশীল শব্দই ব্যবহার করা হয়, অশ্লীল শব্দ নয়।

কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাপারে বলা যায়, সেখানে 'নিকাহ' একটি পারিভাষিক শব্দ। সেখানে এর অর্থ হচ্ছে নিছক বিবাহ অথবা বিবাহোত্তর সংগম। কিন্তু বিবাহ বিহীন সংগম

অর্থে একে কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। এ ধরনের সংগমকে তো কুরআন ও সুন্নাত বিয়ে নয়, যিনা ও ব্যভিচার বলে।

৮৬. এটি একটি একক আয়াত। সম্ভবত সে সময় তালাকের কোন সমস্যা সৃষ্টি হবার কারণে এটি নাযিল হয়েছিল। তাই পূর্ববর্তী বর্ণনা ও পরবর্তী বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে একে রেখে দেয়া হয়েছে। এ বিন্যাসের ফলে একথা স্বতস্ফূর্তভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটি পূর্ববর্তী ভাষণের পরে এবং পরবর্তী ভাষণের পূর্বে নাযিল হয়।

এ আয়াত থেকে যে আইনগত বিধান বের হয় তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে ঃ

এক ঃ আয়াতে যদিও "মু'মিন নারীরা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা থেকে বাহ্যত অনুমান করা যেতে পারে যে, এখানে যে আইনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে কিতাবী (ইহুদী ও খৃষ্টান) নারীদের ব্যাপারে সে আইন কার্যকর নয়। কিন্তু উম্মাতের সকল উলামা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পরোক্ষভাবে কিতাবী নারীদের জন্যও এ একই হুকুম কার্যকর হবে। অর্থাৎ কোন আহ্‌লি কিতাব নারীকে যদি কোন মুসলমান বিয়ে করে, তাহলে তার তালাক, মহর, ইদ্দত এবং তাকে তালাকের পরে কাপড়–চোপড় দেবার যাবতীয় বিধান একজন মু'মিন নারীকে বিয়ে করার অবস্থায় যা হয়ে থাকে তাই হবে। উলামা এ ব্যাপারে একমত, আল্লাহ এখানে বিশেষভাবে যে কেবলমাত্র মু'মিন নারীদের কথা বলেছেন এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবলমাত্র এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা যে, মুসলমানদের জন্য মু'মিন নারীরাই উপযোগী। ইহুদি ও খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করা অবশ্যই জায়েয কিন্তু তা সংগত ও পছন্দনীয় নয়। অন্যকথায় বলা যায়, কুরআনের এ বর্ণনারীতি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মু'মিনগণ মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে করবে আল্লাহ এটাই চান।

দুই ঃ "স্পর্শ করা বা হাত লাগানো" এর আভিধানিক অর্থ তো হয় নিছক ছুঁয়ে দেয়া। কিন্তু এখানে এ শব্দটি রূপক অর্থে সহবাসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দাবী হচ্ছে এই যে, যদি স্বামী সহবাস না করে থাকে, তাহলে সে স্ত্রীর সাথে একান্তে (খাল্‌ওয়াত) অবস্থান করলেও বরং তার গায়ে হাত লাগালেও এ অবস্থায় তালাক দিলে ইদ্দত অপরিহার্য হবে না। কিন্তু ফকীহগণ সতর্কতামূলকভাবে এ বিধান দিয়েছেন যে, যদি "খাল্‌ওয়াতে সহীহা" তথা সঠিক অর্থে একান্তে অবস্থান সম্পন্ন হয়ে গিয়ে থাকে (অর্থাৎ যে অবস্থায় স্ত্রী সংগম সম্ভব হয়ে থাকে) তাহলে এরপর তালাক দেয়া হলে ইদ্দত অপরিহার্য হবে এবং একমাত্র এমন অবস্থায় ইদ্দত পালন করতে হবে না যখন খাল্‌ওয়াতের (একান্তে অবস্থান) পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়া হবে।

তিন ঃ খাল্‌ওয়াতের পূর্বে তালাক দিলে ইদ্দত নাকচ হয়ে যাবার অর্থ হচ্ছে, এ অবস্থায় পুরুষের রুজু' করার অর্থাৎ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার খতম হয়ে যায় এবং তালাকের পরপরই যাকে ইচ্ছা বিয়ে করার অধিকার নারীর থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ বিধান শুধুমাত্র খাল্‌ওয়াতের পূর্বে তালাক দেবার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি খাল্‌ওয়াতের পূর্বে স্বামী মারা যায় তাহলে এ অবস্থায় স্বামীর মৃত্যুর পর যে ইদ্দত পালন করতে হয় তা বাতিল হয়ে যাবে না বরং বিবাহিতা স্বামীর সাথে সহবাস করেছে এমন স্ত্রীর জন্য চারমাস দশ দিনের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয় তাই তার জন্যও ওয়াজিব হবে। (ইদ্দত

বলতে এমন সময়কাল বুঝায় যা অতিবাহিত হবার পূর্বে নারীর জন্য দ্বিতীয় বিবাহ জায়েয নয়)

চার ঃ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ (তোমাদের জন্য তাদের ওপর কোন ইদ্দত অপরিহার্য হবে না) এ শব্দগুলো একথা প্রকাশ করে যে, ইদ্দত হচ্ছে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার। কিন্তু এর এ অর্থ নয় যে, এটা শুধুমাত্র পুরুষের অধিকার। আসলে এর মধ্যে রয়েছে আরো দু'টি অধিকার। একটি হচ্ছে সন্তানের অধিকার এবং অন্যটি আল্লাহর বা শরীয়াতের অধিকার। পুরুষের অধিকার হচ্ছে এ জন্য যে, এ অন্তরবর্তীকালে তার রুজু' করার অধিকার থাকে। তাছাড়া আরো এ জন্য যে, তার সন্তানের বংশ প্রমাণ ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। সন্তানের অধিকার এর মধ্যে শামিল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, পিতা থেকে পুত্রের বংশ-ধারা প্রমাণিত হওয়া তার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য জরুরী এবং তার নৈতিক মর্যাদাও তার বংশধারা সংশয়িত না হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তারপর এর মধ্যে আল্লাহর অধিকার (বা শরীয়াতের অধিকার) এ জন্য শামিল হয়ে যায় যে, যদি লোকদের নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের অধিকারের পরোয়া না-ই বা হয় তবুও আল্লাহর শরীয়াত এ অধিকারগুলোর সংরক্ষণ জরুরী গণ্য করে। এ কারণেই কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে একথা লিখে দেয় যে, আমার মৃত্যুর পর অথবা আমার থেকে তালাক নেবার পর তোমার ওপর আমার পক্ষ থেকে কোন ইদ্দত ওয়াজিব হবে না তবুও শরীয়াত কোন অবস্থায়ই তা বাতিল করবে না।

পাঁচ ঃ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (এদেরকে কিছু সম্পদ দিয়ে ভালো মতো বিদায় করে দাও) এ হুকুমটির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে দু'টি পদ্ধতির মধ্য থেকে কোন একটি পদ্ধতিতে। যদি বিয়ের সময় মহর নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং তারপর খাল্‌ওয়াতের (স্বামী স্ত্রীর একান্ত অবস্থান) পূর্বে তালাক দেয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এ অবস্থায় অর্ধেক মহ্‌র দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে যেমন সূরা বাকারার ২৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে এর বেশী আর কিছু দেয়া অপরিহার্য নয় কিন্তু মুস্তাহাব। যেমন এটা পছন্দনীয় যে, অর্ধেক মহ্‌র দেবার সাথে সাথে বিয়ের কনে সাজাবার জন্য স্বামী তাকে যে কাপড় চোপড় দিয়েছিল তা তার কাছে থাকতে দেবে অথবা যদি আরো কিছু জিনিস পত্র বিয়ের সময় তাকে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো ফেরত নেয়া হবে না। কিন্তু যদি বিয়ের সময় মহ্‌র নির্ধারিত না করা হয়ে থাকে তাহলে এ অবস্থায় স্ত্রীকে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করে দেয়া ওয়াজিব। আর এ "কিছু না কিছু" হতে হবে মানুষের মর্যাদা ও সামর্থ অনুযায়ী। যেমন সূরা বাকারার ২৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে। আলেমগণের একটি দল এ মতের প্রবক্তা যে, মহ্‌র নির্ধারিত থাকা বা না থাকা অবস্থায়ও অবশ্যই "মুতা-ই-তালাক" দেয়া ওয়াজিব। (ইসলামী ফিকাহর পরিভাষায় মুতা-ই-তালাক এমন সম্পদকে বলা হয় যা তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় নারীকে দেয়া হয়)

ছয় ঃ ভালোভাবে বিদায় করার অর্থ কেবল "কিছু না কিছু" দিয়ে বিদায় করা নয় বরং একথাও এর অন্তরভুক্ত যে, কোনপ্রকার অপবাদ না দিয়ে এবং বেইজ্জত না করে ভদ্রভাবে আলাদা হয়ে যাওয়া। কোন ব্যক্তির যদি স্ত্রী পছন্দ না হয় অথবা অন্য কোন অভিযোগ দেখা দেয় যে কারণে সে স্ত্রীকে রাখতে চায় না, তাহলে ভালো লোকদের মতো

সে তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেবে। এমন যেন না হয় যে, সে তার দোষ লোকদের সামনে বলে বেড়াতে থাকবে এবং তার বিরুদ্ধে এমনভাবে অভিযোগের দপ্তর খুলে বসবে যে অন্য কেউ আর তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। কুরআনের এ উক্তি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যায় যে, তালাকের প্রয়োগকে কোন পাঞ্চায়েত বা আদালতের অনুমতির সাথে সংশ্লিষ্ট করা আল্লাহর শরীয়াতের জ্ঞান ও কল্যাণনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ এ অবস্থায় "ভালোভাবে বিদায় দেবার" কোন সম্ভাবনাই থাকে না। বরং স্বামী না চাইলেও অপমান, বেইজ্জতি ও দুর্নামের ঝক্কি পোহাতে হবেই। তাছাড়া পুরুষের তালাক দেবার ইখতিয়ার কোন পঞ্চায়েত বা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষ হবার কোন অবকাশই আয়াতের শব্দাবলীতে নেই। আয়াত একদম স্পষ্টভাবে বিবাহকারী পুরুষকে তালাকের ইখতিয়ার দিচ্ছে এবং তার ওপরই দায়িত্ব আরোপ করছে, সে যদি হাত লাগাবার পূর্বে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায় তাহলে অবশ্যই অর্ধেক মহর দিয়ে বা নিজের সামর্থ অনুযায়ী কিছু সম্পদ দিয়ে তাকে বিদায় করে দেবে। এ থেকে পরিষ্কারভাবে আয়াতের এ উদ্দেশ্য জানা যায় যে, তালাককে খেলায় পরিণত হওয়ার পথ রোধ করার জন্য পুরুষের ওপর আর্থিক দায়িত্বের একটি বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে সে নিজের তালাকের ইখতিয়ারকে ভেবে চিন্তে ব্যবহার করবে এবং পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের কোন হস্তক্ষেপও হতে পারবে না। বরং স্বামী কেন স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে একথা কাউকে বলতে বাধ্য হবার কোন সুযোগই আসবে না।

সাত ঃ ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান বাসরী, আলী ইবনুল হোসাইন (যয়নুল আবেদীন), ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল আয়াতের "যখন তোমরা বিয়ে করো এবং তারপর তালাক দিয়ে দাও" শব্দাবলী থেকে এ বিধান নির্ণয় করেছেন যে, তালাক তখনই সংঘটিত হবে যখন তার পূর্বে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। বিয়ের পূর্বে তালাক কার্যকর হয় না। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি বলে, "আমি অমুক মেয়েকে বা অমুক গোত্র বা জাতির মেয়েকে অথবা কোন মেয়েকে বিয়ে করলে তাকে তালাক" তাহলে তার এ উক্তি অর্থহীন ও অকার্যকর হবে। এতে কোন তালাক হতে পারে না। এ চিন্তার সমর্থনে এ হাদীস পেশ করা যায়, রসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ لا طلاق لابن ادم فى ما لا يملك "ইবনে আদম যে জিনিসের মালিক নয় তার ব্যাপারে তালাকের ইখ্তিয়ার ব্যবহার করার অধিকার তার নেই।" (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ) তিনি আরো বলেছেন ঃ لا طلاق قبل النكاح "বিয়ের পূর্বে কোন তালাক নেই" (ইবনে মাজাহ) কিন্তু ফকীহদের একটি বড় দল বলেন, এ আয়াত ও এ হাদীসগুলো কেবলমাত্র তখনই প্রযুক্ত হবে যখন কোন ব্যক্তি তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়নি এমন কোন মেয়েকে এভাবে বলে, "তোমাকে তালাক" অথবা "আমি তোমাকে তালাক দিলাম।" এ উক্তি নিসন্দেহে অর্থহীন ও উদ্ভট। এর ওপর কোন আইনগত ফলাফল বলবৎ হবে না। কিন্তু যদি সে এভাবে বলে, "যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে তোমাকে তালাক", তাহলে এটা বিয়ে করার পূর্বে তালাক দেয়া নয় বরং আসলে সে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং ঘোষণা করছে যে, যখন সেই মেয়েটির সাথে তার বিয়ে হবে তখন তার ওপর তালাক অনুষ্ঠিত হবে। এ উক্তি অর্থহীন, উদ্ভট ও প্রভাবহীন হতে পারে না। বরং যখনই মেয়েটিকে সে বিয়ে করবে তখনই তার ওপর

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـٰلَـٰتِكَ ٱلَّـٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

হে নবী! আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি তোমার স্ত্রীদেরকে যাদের মহর তুমি আদায় করে দিয়েছো,[৮৭] এবং এমন নারীদেরকে যারা আল্লাহ প্রদত্ত বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাধীন হয়েছে আর তোমার চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত বোনদেরকে, যারা তোমার সাথে হিজরাত করেছে এবং এমন মু'মিন নারীকে যে নিজেকে নবীর কাছে নিবেদন করেছে যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায়,[৮৮] এ সুবিধাদান বিশেষ করে তোমার জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।[৮৯] সাধারণ মু'মিনদের ওপর তাদের স্ত্রী ও বাঁদীদের ব্যাপারে আমি যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছি তা আমি জানি, (তোমাকে এ সীমারেখা থেকে এ জন্য আলাদা রেখেছি) যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়,[৯০] আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। যেসব ফকীহ এ মত অবলম্বন করেছেন তাঁদের মধ্যে আবার এ বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে যে, এ ধরনের তালাকের প্রয়োগ সীমা কতখানি।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম যুফার বলেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন মেয়ে, কোন জাতি বা কোন গোত্র নির্দেশ করে বলে অথবা উদাহরণ স্বরূপ সাধারণ কথায় এভাবে বলে, "যে মেয়েকেই আমি বিয়ে করবো তাকেই তালাক।" তাহলে উভয় অবস্থায়ই তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। আবু বকর জাস্সাস এ একই অভিমত হযরত ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ইবরাহীম নাখাঈ, মুজাহিদ ও উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহেমাহুমুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

সুফিয়ান সওরী ও উসমানুল বাত্তী বলেন, তালাক কেবলমাত্র তখনি হবে যখন বক্তা এভাবে বলবে, "যদি আমি অমুক মেয়েকে বিয়ে করি তাহলে তার ওপর তালাক সংগঠিত হবে।"

হাসান ইবনে সালেহ, লাইস ইবনে সা'দ ও আমেরুশ শা'বী বলেন, এ ধরনের তালাক সাধারণভাবেও সংঘটিত হতে পারে, তবে শর্ত এই যে, এর প্রয়োগক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন এক ব্যক্তি এভাবে বললো ঃ "যদি আমি অমুক পরিবার, অমুক গোত্র, অমুক শহর, অমুক দেশ বা অমুক জাতির মেয়ে বিয়ে করি, তাহলে তার ওপর তালাক কার্যকর হবে।"

ইবনে আবী লাইলা ও ইমাম মালেক ওপরে উদ্ধৃত মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন এবং বলেন, এর মধ্যে সময়–কালও নির্ধারিত হতে হবে। যেমন, যদি এক ব্যক্তি এভাবে বলে, "যদি আমি এ বছর বা আগামী দশ বছরের মধ্যে অমুক মেয়ে বা অমুক দলের মেয়েকে বিয়ে করি, তাহলে তার ওপর তালাক কার্যকর হবে অন্যথায় তালাক হবে না। বরং ইমাম মালেক এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করেন যে, যদি এ সময়–কাল এতটা দীর্ঘ হয় যার মধ্যে ঐ ব্যক্তির জীবিত থাকার আশা করা যায় না তাহলে তার উক্তি অকার্যকর হয়ে যাবে।

৮৭. যারা আপত্তি করে বলতো, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো অন্যদের জন্য একই সময় চারজনের বেশী স্ত্রী রাখতে নিষেধ করেন কিন্তু তিনি নিজে পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করলেন কেমন করে," এখানে আসলে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে। এ আপত্তির ভিত্তি ছিল এরি ওপর যে, হযরত যয়নবকে (রা) বিয়ে করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ছিলেন চারজন। এদের একজন ছিলেন হযরত সওদা (রা)। তাঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন হিজরাতের ৩ বছর আগে। দ্বিতীয় ছিলেন হযরত আয়েশা (রা)। তাঁকেও হিজরাতের ৩ বছর আগে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু হিজরী প্রথম বছরের শওয়াল মাসে তিনি স্বামীগৃহে আসেন। তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন হযরত হাফসা (রা) ৩ হিজরীর শাবান মাসে তাঁকে বিয়ে করেন। চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন হযরত উম্মে সালামাহ (রা)। ৪ হিজরীর শওয়াল মাসে নবী করীম (সা) তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এভাবে হযরত যয়নব (রা) ছিলেন তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুনাফিকরা যে আপত্তি জানাচ্ছিল তার জবাব আল্লাহ এভাবে দিচ্ছেন ঃ হে নবী! তোমার এ পাঁচজন স্ত্রী, যাদের মহ্‌র আদায় করে তুমি বিয়ে করেছো, তাদেরকে আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি। অন্যকথায় এ জবাবের অর্থ হচ্ছে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য চার–এর সীমানির্দেশও আমিই করেছি এবং নিজের নবীকে এ সীমার উর্ধেও রেখেছি আমিই। যদি তাদের জন্য সীমানির্দেশ করার ইখতিয়ার আমার থেকে থাকে, তাহলে নবীকে সীমার উর্ধে রাখার ইখতিয়ার আমার থাকবে না কেন?

এ জবাবের ব্যাপারে আবার একথা মনে রাখতে হবে যে, এর সাহায্যে কাফের ও মুনাফিকদেরকে নিশ্চিন্ত করা এর উদ্দেশ্য নয় বরং এমন মুসলমানদেরকে নিশ্চিন্ত করা এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম বিরোধীরা যাদের মনে সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল। তারা যেহেতু বিশ্বাস করতো, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর নিজের শব্দসহই এ কুরআন নাযিল হয়েছে, তাই কুরআনের একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বলিত আয়াতের মাধ্যমে

আল্লাহ এ ঘোষণা দিয়েছেন ঃ নবী নিজেই নিজেকে চারজন স্ত্রী রাখার সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রাখেননি বরং এ ব্যবস্থা আমিই করেছি।

৮৮.পঞ্চম স্ত্রীকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হালাল করা ছাড়াও আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর জন্য আরো কয়েক ধরনের মহিলাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন ঃ

এক ঃ আল্লাহ প্রদত্ত বাঁদীদের মধ্য থেকে যারা তাঁর মালিকানাধীন হয়। এ অনুমতি অনুযায়ী তিনি বনী কুরাইযার যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত রাইহানাকে (রা), বনিল মুস্তালিকের যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত যুওয়াইরাকে (রা), খয়বরের যুদ্ধ–বন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত সফীয়াকে (রা) এবং মিসরের মুকাওকিস প্রেরিত হযরত মারিয়া কিব্‌তিয়াকে (রা) নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। এঁদের মধ্য থেকে প্রথমোক্ত তিনজনকে তিনি মুক্তি দান করে তাদেরকে বিয়ে করেন। কিন্তু হযরত মারিয়া কিব্‌তিয়ার (রা) সাথে মালিকানাধীন হবার ভিত্তিতে সহবাস করেন। তিনি তাঁকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন একথা তাঁর সম্পর্কে প্রমাণিত নয়।

দুই ঃ তাঁর চাচাত, মামাত, ফুফাত ও খালাত বোনদের মধ্য থেকে যাঁরা হিজরাতে তাঁর সহযোগী হন। আয়াতে তাঁর সাথে হিজরাত করার যে কথা এসেছে তার অর্থ এ নয় যে, হিজরাতের সফরে তাঁর সাথেই থাকতে হবে বরং এর অর্থ ছিল, ইসলামের জন্য তাঁরাও আল্লাহর পথে হিজরাত করেন। তাঁর ওপরে উল্লেখিত মুহাজির আত্মীয়দের মধ্য থেকেও যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়ে করার ইখতিয়ারও তাঁকে দেয়া হয়। কাজেই এ অনুমতির ভিত্তিতে তিনি ৭ হিজরী সালে হযরত উম্মে হাবীবাকে (রা) বিয়ে করেন। (পরোক্ষভাবে এ আয়াতে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, চাচা, মামা, ফুফী ও খালার মেয়েকে বিয়ে করা একজন মুসলমানের জন্য হালাল। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াত খৃষ্ট ও ইহুদী উভয় ধর্ম থেকে আলাদা। খৃষ্টীয় বিধানে এমন কোন মহিলাকে বিয়ে করা অবৈধ যার সাথে সাত পুরুষ পর্যন্ত পুরুষের বংশধারা মিলে যায়। আর ইহুদীদের সমাজে সহোদর ভাইঝি ও ভাগ্নীকেও বিয়ে করা বৈধ।)

তিন ঃ যে মু'মিন নারী নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য 'হিবা', তথা দান করে অর্থাৎ মহ্‌র ছাড়াই নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে তৈরি হয়ে যায় এবং নবী (সা) তা গ্রহণ করা পছন্দ করেন। এ অনুমতির ভিত্তিতে তিনি ৭ হিজরীর শওয়াল মাসে হযরত মায়মুনাকে (রা) নিজের সহধর্মিনী রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু মহ্‌র ছাড়া তার হিবার সুযোগ নেয়া পছন্দ করেননি । তাই তার কোন আকাংখা ও দাবী ছাড়াই তাঁকে মহ্‌র দান করেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হিবাকারিনী স্ত্রী ছিল না। কিন্তু এর অর্থ আসলে হচ্ছে এই যে, তিনি হিবাকারিনী কোন স্ত্রীকেও মহ্‌র থেকে বঞ্চিত করেননি।

৮৯. এ বাক্যটির সম্পর্ক যদি নিকটের বাক্যের সাথে মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, অন্য কোন মুসলমানের জন্য কোন মহিলা নিজেকে তার হাতে হিবা করবে এবং সে মহ্‌র ছাড়াই তাকে বিয়ে করবে, এটা জায়েয নয়। আর যদি ওপরের সমস্ত

ইবারতের সাথে এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, চারটির বেশী বিয়ে করার সুবিধাও একমাত্র নবী করীমের (সা) জন্যই নির্দিষ্ট, সাধারণ মুসলমানের জন্য নয়। এ আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, কিছু বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে, উম্মাতের অন্য লোকেরা এ ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক নেই। কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে এ ধরনের বহু বিধানের কথা জানা যায়। যেমন নবী করীমের (সা) জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল এবং সমগ্র উম্মাতের জন্য তা নফল। তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য সাদ্‌কা নেয়া হারাম এবং অন্য কারোর জন্য তা হারাম নয়। তাঁর মীরাস বন্টন হতে পারতো না কিন্তু অন্য সকলের মীরাস বন্টনের জন্য সূরা নিসায় বিধান দেয়া হয়েছে। তাঁর জন্য চারজনের অধিক স্ত্রী হালাল করা হয়েছে। স্ত্রীদের মধ্যে সমতাপূর্ণ ইনসাফ তাঁর জন্য ওয়াজিব করা হয়নি। নিজেকে হিবাকারী নারীকে মহ্‌র ছাড়াই বিয়ে করার অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে সমগ্র উম্মাতের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমন একটি বিশেষত্বও নেই যা নবী করীম (সা) ছাড়া অন্য কোন মুসলমানও অর্জন করেছে। মুফাস্‌সিরগণ তাঁর আর একটি বৈশিষ্টও বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, আহ্‌লি কিতাবের কোন মহিলাকে বিয়ে করাও তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। অথচ উম্মাতের সবার জন্য তারা হালাল।

৯০. সাধারণ নিয়ম থেকে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে আলাদা রেখেছেন তার মধ্যে রয়েছে এ সুবিধা ও কল্যাণ। "যাতে সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না থাকে"–এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রবৃত্তির লালসা খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল বলে তাঁকে বহু স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়, যাতে শুধুমাত্র চারজন স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে তিনি সংকীর্ণতা ও অসুবিধা অনুভব না করেন। এ বাক্যাংশের এ অর্থ কেবলমাত্র এমন এক ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে যে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতিতে অন্ধ হয়ে একথা ভুলে যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ বছর বয়সে এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেন যাঁর বয়স ছিল তখন ৪০ বছর এবং পুরো ২৫ বছর ধরে তিনি তাঁর সাথে অত্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করতে থাকেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি অন্য একজন অধিক বয়সের বিগত যৌবনা মহিলা হযরত সওদাকে (রা) বিয়ে করেন। পুরো চার বছর পর্যন্ত তিনি একাই ছিলেন তাঁর স্ত্রী। এখন কোন্ বুদ্ধিমান বিবেকবান ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারে যে, ৫৩ বছর পার হয়ে যাবার পর সহসা তাঁর যৌন কামনা বেড়ে যেতে থাকে এবং তাঁর অনেক বেশী সংখ্যক স্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে? আসলে "সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না থাকে"–এর অর্থ অনুধাবন করতে হলে একদিকে নবী করীমের (সা) ওপর আল্লাহ যে মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং অন্যদিকে যে অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাঁকে এ মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন তা অনুধাবন করা জরুরী। সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি থেকে মন–মানসিকতাকে মুক্ত করে যে ব্যক্তিই এ দু'টি সত্য অনুধাবন করবেন তিনিই স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে ব্যাপক অনুমতি দেয়া কেন জরুরী ছিল এবং চারের সীমারেখা নির্দেশের মধ্যে তাঁর জন্য কি "সংকীর্ণতা ও অসুবিধা" ছিল তা ভালোভাবেই জানতে পারবেন।

নবী করীমকে (সা) যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা ছিল এই যে, তিনি একটি অসংগঠিত ও অপরিপক্ক জাতিকে, যারা কেবল ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং সাধারণ সভ্যতা সংস্কৃতির দৃষ্টিতেও ছিল অগোছালো ও অগঠিত, তাদেরকে জীবনের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি উন্নত পর্যায়ের সুসভ্য, সংস্কৃতিবান ও পরিচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত করবেন। এ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে অনুশীলন দেয়া যথেষ্ট ছিল না বরং মহিলাদের অনুশীলনও সমান জরুরী ছিল। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে মূলনীতি শিখাবার জন্য তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন তার দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল এবং এ নিয়ম ভংগ করা ছাড়া তাঁর পক্ষে মহিলাদেরকে সরাসরি অনুশীলন দান করা সম্ভবপর ছিল না। তাই মহিলাদের মধ্যে কাজ করার কেবলমাত্র একটি পথই তাঁর জন্য খোলা ছিল এবং সেটি হচ্ছে, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদেরকে তিনি বিয়ে করতেন, নিজে সরাসরি তাদেরকে অনুশীলন দান করে তাঁর নিজের সাহায্য সহায়তার জন্য প্রস্তুত করতেন এবং তারপর তাদের সাহায্যে নগরবাসী ও মরুচারী এবং যুবতী, পৌঢ় ও বৃদ্ধা সব ধরনের নারীদেরকে দীন, নৈতিকতা ও কৃষ্টি সংস্কৃতির নতুন নীতিসমূহ শিখবার ব্যবস্থা করতেন।

এ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরাতন জাহেলী জীবন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় কার্যত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল। এ দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য জাহেলী জীবন ব্যবস্থার প্রবক্তা ও পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল। এ সংঘাত এমন একটি দেশে শুরু হতে যাচ্ছিল যেখানে গোত্রীয় জীবনধারা নিজের বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক অবয়বে প্রচলিত ছিল। এ অবস্থায় অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন পরিবারে বিয়ে করে বহুবিধ বন্ধুত্বকে পাকাপোক্ত এবং বহুতর শত্রুতাকে খতম করার ব্যবস্থা করা তাঁর জন্য জরুরী ছিল। তাই যেসব মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলী ছাড়াও তাঁদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ও কমবেশী জড়িত ছিল। হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত হাফসাকে (রা) বিয়ে করে তিনি হযরত আবুবকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) সাথে নিজের সম্পর্ককে আরো বেশী গভীর ও মজবুত করে নেন। হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ছিলেন এমন এক পরিবারের মেয়ে যার সাথে ছিল আবু জেহেল ও খালেদ ইবনে ওলিদের সম্পর্ক। হযরত উম্মে হাবীবা (রা) ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। এ বিয়েগুলো সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর শত্রুতার জের অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। বরং হযরত উম্মে হাবীবার সাথে নবী করীমের (সা) বিয়ে হবার পর আবু সুফিয়ান আর কখনো তাঁর মোকাবিলায় অস্ত্র ধরেননি। হযরত সফিয়া (রা), হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) ও হযরত রাইহানা (রা) ইহুদি পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তাঁদেরকে মুক্ত করে দিয়ে যখন নবী করীম (সা) তাঁদেরকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদিদের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ সে যুগের আরবীয় রীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির সাথে কোন গোত্রের মেয়ের বিয়ে হতো তাঁকে কেবল মেয়েটির পরিবারেরই নয় বরং সমগ্র গোত্রের জামাতা মনে করা হতো এবং জামাতার সাথে যুদ্ধ করা ছিল বড়ই লজ্জাকর।

সমাজের কার্যকর সংশোধন এবং তার জাহেলী রসম রেওয়াজ নির্মূল করাও তাঁর নবুওয়াতের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। কাজেই এ উদ্দেশ্যেও তাঁকে একটি বিয়ে করতে হয়। এ সূরা আহযাবে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۖ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾

তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে, তোমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাকে চাও নিজের থেকে আলাদা করে রাখো, যাকে চাও নিজের সাথে রাখো এবং যাকে চাও আলাদা রাখার পরে নিজের কাছে ডেকে নাও। এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। এভাবে বেশী আশা করা যায় যে, তাদের চোখ শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না আর যা কিছুই তুমি তাদেরকে দেবে তাতে তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে।[৯১] *আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল।*[৯২]

এসব বিষয় বিয়ের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কোন রকম সংকীর্ণতা ও অসুবিধা না রাখার তাগাদা করছিল। এর ফলে যে মহান দায়িত্ব তাঁর প্রতি অর্পিত হয়েছিল তার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিয়ে করতে পারতেন।

যারা মনে করেন একাধিক বিয়ে কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই বৈধ এবং সেগুলো ছাড়া তা বৈধ হবার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, এ বর্ণনা থেকে তাদের চিন্তার বিভ্রান্তিও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। একথা সুস্পষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক বিয়ে করার পেছনে তাঁর স্ত্রীর রুগ্নতা, বন্ধ্যাত্ব বা সন্তানহীনতা অথবা এতিম প্রতিপালনের সমস্যা ছিল না। এসব সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া তিনি সমস্ত বিয়ে করেন প্রচার ও শিক্ষামূলক প্রয়োজনে অথবা সমাজ সংস্কারার্থে কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে। প্রশ্ন হচ্ছে, যখন আজ হাতেগোনা যে কয়টি বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ নিজেই সেগুলোর জন্য একাধিক বিয়েকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি এবং আল্লাহর রসূল এগুলো ছাড়া আরো অন্যান্য বহু উদ্দেশ্যে একাধিক বিয়ে করেছেন তখন অন্য ব্যক্তি আইনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কতিপয় শর্ত ও বিধি–নিষেধ আরোপ করার এবং সে শরীয়াত অনুযায়ী এ সীমা নির্ধারণ করছে বলে দাবী করার কী অধিকার রাখে? আসলে একাধিক বিয়ে মূলতই একটি অপকর্ম, এই পাশ্চাত্য ধারণাটি উক্ত সীমা নির্ধারণের মূলে কাজ করছে। উক্ত ধারণার ভিত্তিতে এ মতবাদেরও জন্ম হয়েছে যে, এ হারাম কাজটি যদি কখনো হালাল হয়েও যায় তাহলে তা কেবলমাত্র অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই হতে পারে। এখন এ বাইর থেকে আমদানী করা চিন্তার ওপর ইসলামের জাল ছাপ লাগাবার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন কুরআন ও সুন্নাহ এবং সমগ্র উম্মাতে মুসলিমার সাহিত্য এর সাথে মোটেই পরিচিত নয়।

৯১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংসার জীবনের সংকটমুক্ত করাই ছিল এ আয়াতটির উদ্দেশ্য। এর ফলে তিনি পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে নিজের কাজ করতে পারবেন। যখন আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় তাঁকে পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে যার সাথে তিনি যেমন ব্যবহার করতে চান তা করার ইখতিয়ার দিয়ে দেন তখন এ মু'মিন ভদ্রমহিলাদের তাঁকে কোনভাবে পেরেশান করার অথবা পরস্পর ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার কলহ সৃষ্টি করে সমস্যার মুখোমুখি করার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে এ ইখতিয়ার লাভ করার পরও নবী করীম (সা) সকল স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ কায়েম করেন, কাউকেও কারো ওপর প্রাধান্য দেননি এবং যথারীতি পালা নির্ধারণ করে তিনি সবার কাছে যেতে থাকেন। মুহাদ্দিসদের মধ্যে একমাত্র আবু রাযীন বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) কেবলমাত্র চারজন স্ত্রীর (হযরত আয়েশা, হযরত হাফসাহ, হযরত যয়নব ও হযরত উম্মে সালামাহ) জন্য পালা নির্ধারণ করেন, বাকি অন্য সকল স্ত্রীর জন্য কোন পালা নির্দিষ্ট করেননি। কিন্তু অন্য সকল মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির এর প্রতিবাদ করেন। তাঁরা অত্যন্ত শক্তিশালী রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এ প্রমাণ পেশ করেন যে, এ ইখতিয়ার লাভ করার পরও নবী করীম (সা) সকল স্ত্রীর কাছে পালাক্রমে যেতে থাকেন এবং সবার সাথে সমান ব্যবহার করতে থাকেন। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ ও আবু দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আয়েশার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "এ আয়াত নাযিলের পর নবী করীমের (সা) রীতি এটিই ছিল যে, তিনি আমাদের মধ্য থেকে কোন স্ত্রীর পালার দিন অন্য স্ত্রীর কাছে যেতে হলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবে যেতেন।" আবু বকর জাস্সাস হযরত উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালা বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দিতেন না। যদিও এমন ঘটনা খুব কমই ঘটতো যে, তিনি একই দিন নিজের সকল স্ত্রীর কাছে যাননি তবুও যে স্ত্রীর পালার দিন হতো সেদিন তাকে ছাড়া আর কাউকে স্পর্শও করতেন না।" হযরত আয়েশা (রা) এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন ঃ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ রোগে আক্রান্ত হন এবং চলাফেরা করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে তখন তিনি সকল স্ত্রীদের থেকে অনুমতি চান এই মর্মে, আমাকে আয়েশার কাছে থাকতে দাও। তারপর যখন সবাই অনুমতি দেন তখন তিনি শেষ সময়ে হযরত আয়েশার (রা) কাছে থাকেন। ইবনে আবি হাতেম ইমাম যুহরীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন স্ত্রীকে পালা থেকে বঞ্চিত করার কথা প্রমাণিত নয়। একমাত্র হযরত সওদা (রা) এর ব্যতিক্রম। তিনি সানন্দে নিজের পালা হযরত আয়েশাকে (রা) দিয়ে দেন। কারণ তিনি অনেক বয়োবৃদ্ধা হয়ে পড়েছিলেন।

এখানে কারো মনে এ ধরনের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর নবীর জন্য নাউযুবিল্লাহ কোন অন্যায় সুবিধা দান করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের অধিকার হরণ করেছিলেন। আসলে যেসব মহৎ কল্যাণ ও সুবিধার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারটি সাধারণ নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছিল নবীকে সাংসারিক জীবনে শান্তি দান করা এবং যেসব কারণে তাঁর মনে পেরেশানী সৃষ্টি হতে পারে সেগুলোর পথ বন্ধ করে দেয়া ছিল সেসব কল্যাণ ও সুবিধারই দাবী। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণের জন্য এটা ছিল বিরাট মর্যাদার ব্যাপার। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

এরপর তোমার জন্য অন্য নারীরা হালাল নয় এবং এদের জায়গায় অন্য স্ত্রীদের আনবে এ অনুমতিও নেই, তাদের সৌন্দর্য তোমাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন,[৯৩] তবে বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার অনুমতি আছে।[৯৪] আল্লাহ সবকিছু দেখাশুনা করছেন।

আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় মহামহিম ব্যক্তিত্বের স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এরি বদৌলতে তাঁরা ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কারের এ মহিমান্বিত কর্মে নবী করীমের (সা) সহযোগী হতে সক্ষম হয়েছিলেন, যিনি কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার কল্যাণের মাধ্যমে পরিণত হতে যাচ্ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানীর পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের সামর্থের শেষ সীমা পর্যন্ত কুরবানী করে চলছিলেন ঠিক তেমনি ত্যাগ স্বীকার করা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণেরও কর্তব্য ছিল। তাই নবী করীমের (সা) সকল স্ত্রী মহান আল্লাহর এ ফায়সালা সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।

৯২. এটি নবী করীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের জন্যও সতর্কবাণী এবং অন্য সমস্ত লোকদের জন্যও। পবিত্র স্ত্রীগণের জন্য এ বিষয়ের সতর্কবাণী যে, আল্লাহর এ হুকুম এসে যাবার পর যদি তাদের হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে তারা পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না। অন্য লোকদের জন্য এর মধ্যে এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে যদি তারা কোন প্রকার ভুল ধারণাও নিজেদের মনে পোষণ করে অথবা চিন্তা–ভাবনার কোন পর্যায়েও কোন প্ররোচনা লালন করতে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে তাদের এ প্রচ্ছন্ন দুষ্কৃতি গোপন থাকবে না। এই সাথে আল্লাহর সহিষ্ণুতা গুণের কথাও বলে দেয়া হয়েছে। এভাবে মানুষ জানবে, নবী সম্পর্কে গাস্তাখীমূলক চিন্তা যদিও কঠিন শাস্তিযোগ্য তবুও যার মনে কখনো এ ধরনের প্ররোচনা সৃষ্টি হয় সে যদি তা বের করে দেয়, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের আশা আছে।

৯৩. এ উক্তির দু'টি অর্থ রয়েছে। এক, ওপরে ৫০ আয়াতে নবী করীমের (সা) জন্য যেসব নারীকে হালাল করে দেয়া হয়েছে তারা ছাড়া আর কোন নারী এখন আর তাঁর জন্য হালাল নয়। দুই, যখন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ অভাবে অনটনে তাঁর সাথে থাকবেন বলে রাজী হয়ে গেছেন এবং আখেরাতের জন্য তাঁরা দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়েছেন আর তিনি তাঁদের সাথে যে ধরনের আচরণ করবেন তাতেই তাঁরা খুশী তখন এ ক্ষেত্রে আর তাঁর জন্য তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে তালাক দিয়ে তাঁর জায়গায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা হালাল নয়।

৯৪. এ আয়াতটি পরিষ্কার করে একথা বর্ণনা করছে যে, বিবাহিতা স্ত্রীগণ ছাড়া মালিকানাধীন নারীদের সাথেও মিলনের অনুমতি রয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা–সীমা নেই। সূরা নিসার ৩ আয়াতে, সূরা মু'মিনূনের ৬ আয়াতে এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত আয়াতে মালিকানাধীন মহিলাদেরকে বিবাহিতা নারীদের মোকাবিলায় একটি আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারপর তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে বৈধ গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও সূরা নিসার ৩ আয়াত বিবাহিতা স্ত্রীদের জন্য ৪ জনের সীমারেখা নির্ধারণ করে। কিন্তু সেখানে আল্লাহ মালিকানাধীন মহিলাদের কোন সংখ্যাসীমা বেঁধে দেননি এবং এতদসংক্রান্ত অন্য আয়াতগুলোতেও কোথাও এ ধরনের কোন সীমার প্রতি ইংগিতও করেননি। বরং এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, আপনার জন্য এরপর অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করা অথবা কাউকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী নিয়ে আসা হালাল নয়। তবে মালিকানাধীন মহিলারা হালাল। এ থেকে পরিষ্কার প্রকাশ হয় মালিকানাধীন মহিলাদের ব্যাপারে কোন সংখ্যা–সীমা নির্ধারিত নেই।

কিন্তু এর অর্থ এ নয়, ইসলামী শরীয়াত ধনীদের অসংখ্য বাঁদী কিনে আয়েশ করার জন্য এ সুযোগ দিয়েছে। বরং আসলে প্রবৃত্তি পূজারী লোকেরা এ আইনটি থেকে অযথা সুযোগ গ্রহণ করেছে। আইন তৈরি করা হয়েছিল মানুষের সুবিধার জন্য। আইন থেকে এ ধরনের সুযোগ গ্রহণের জন্যও তা তৈরি করা হয়নি। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঠিক তেমনি যেমন শরীয়াত একজন পুরুষকে চারজন পর্যন্ত মহিলাকে বিয়ে করার অনুমতি দেয় এবং তাকে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করারও অনুমতি দেয়। মানুষের প্রয়োজন সামনে রেখে এ আইন তৈরি করা হয়েছিল। এখন যদি কোন ব্যক্তি নিছক আয়েশ করার জন্য চারটি মহিলাকে বিয়ে করে কিছুদিন তাদের সাথে থাকার পর তাদেরকে তালাক দিয়ে আবার নতুন করে চারটি বউ ঘরে আনার ধারা চালু করে, তাহলে এটা তো আইনের অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করাই হয়। এর পুরো দায়–দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপরই বর্তাবে, আল্লাহর শরীয়াতের ওপর নয়। অনুরূপভাবে যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত মহিলাদেরকে যখন তাদের জাতি মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে ফিরিয়ে নিতে অথবা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসে না তখন ইসলামী শরীয়াত তাদেরকে বাঁদী হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেসব ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয় তাদের ঐ সব মহিলার সাথে সংগম করার অধিকার দিয়েছে। এর ফলে তাদের অস্তিত্ব সমাজে নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। তারপর যেহেতু বিভিন্ন যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে আসা লোকদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকতে পারে না, তাই আইনগতভাবে এক ব্যক্তি একই সংগে ক'জন গোলাম বা বাঁদী রাখতে পারে, এরও কোন সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। গোলাম ও বাঁদীদের বেচাকেনাও এ জন্য বৈধ রাখা হয়েছে যে, যদি কোন গোলাম বা বাঁদীর তার মালিকের সাথে বনিবনা না হয় তাহলে সে অন্য মালিকের অধীনে চলে যেতে পারবে এবং এক ব্যক্তির চিরন্তন মালিকানা মালিক ও অধীনস্থ উভয়ের জন্য আযাবে পরিণত হবে না। শরীয়াত এ সমস্ত নিয়ম ও বিধান তৈরি করেছিল মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজন সামনে রেখে তার সুবিধার জন্য। যদি ধনী লোকেরা একে বিলাসিতার মাধ্যমে পরিণত করে নিয়ে থাকে তাহলে এ জন্য শরীয়াত নয়, তারাই অভিযুক্ত হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ
اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ
يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ
وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ
لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ
تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾
اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٤﴾

৭ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! নবী গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না,[৯৫] খাবার সময়ের অপেক্ষায়ও থেকো না। হাঁ যদি তোমাদের খাবার জন্য ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যই এসো[৯৬] কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না।[৯৭] তোমাদের এসব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয় কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না এবং আল্লাহ হককথা বলতে লজ্জা করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের পবিত্রতার জন্য বেশী উপযোগী।[৯৮] তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়েয নয়[৯৯] এবং তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করাও জায়েয নয়,[১০০] এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে মস্তবড় গোনাহ। তোমরা কোন কথা প্রকাশ বা গোপন করো আল্লাহ সবকিছুই জানেন।[১০১]

৯৫. প্রায় এক বছর পরে সূরা নূরে যে সাধারণ হুকুম দেয়া হয় এটা তার ভূমিকা স্বরূপ। প্রাচীন যুগে আরবের লোকেরা নিসংকোচে একজন অন্যজনের ঘরে ঢুকে পড়তো। কেউ যদি কারো সাথে দেখা করতে চাইতো তাহলে দরোজায় দাঁড়িয়ে ডাকার বা অনুমতি নিয়ে ভেতরে যাবার নিয়ম ছিল না। বরং ভেতরে গিয়ে গৃহকর্তা গৃহে আছে কি নেই স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছে জিজ্ঞেস করে তা জানতে চাইতো। এ জাহেলী পদ্ধতি বহু ক্ষতির

কারণ হয়ে পড়েছিল। অনেক সময় বহু নৈতিক অপকর্মেরও সূচনা এখান থেকে হতো। তাই প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে এ নিয়ম জারী করা হয় যে, কোন নিকটতম বন্ধু বা দূরবর্তী আত্মীয়–স্বজন হলেও বিনা অনুমতিতে তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। তারপর সূরা নূরে এ নিয়মটি সমস্ত মুসলমানের গৃহে জারী করার সাধারণ হুকুম দিয়ে দেয়া হয়।

৯৬. এ প্রসংগে এটা দ্বিতীয় হুকুম। আরববাসীদের মধ্যে যেসব সভ্যতা বিবর্জিত আচরণের প্রচলন ছিল তার মধ্যে একটি এও ছিল যে, কোন বন্ধু বা পরিচিত লোকের গৃহে তারা পৌঁছে যেতো ঠিক খাবার সময় তাক করে। অথবা তার গৃহে এসে বসে থাকতো এমনকি খাবার সময় এসে যেতো। এহেন আচরণে গৃহকর্তা অধিকাংশ সময় বেকায়দায় পড়ে যেতো। মুখ ফুটে যদি বলে এখন আমার খাবার সময়, মেহেরবানী করে চলে যান, তাহলে বড়ই অসভ্যতা ও রুঢ়তার প্রকাশ হয়। আর যদি খাওয়ায়, তাহলে হঠাৎ আগত কতজনকে খাওয়াবে। যখনই যতজন লোকই আসুক সবসময় সংগে সংগেই তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করার মতো সামর্থ সবাই রাখে না। আল্লাহ এ অভদ্র আচরণ করতে তাদেরকে নিষেধ করেন এবং হুকুম দেন, কোন ব্যক্তির গৃহে খাওয়ার জন্য তখনই যেতে হবে যখন গৃহকর্তা খাওয়ার দাওয়াত দেবে। এ হুকুম শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং সেই আদর্শগৃহে এ নিয়ম এ জন্যই জারী করা হয়েছিল যেন তা মুসলমানদের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনের নিয়মে ও বিধানে পরিণত হয়ে যায়।

৯৭. এটি আরো একটি অসভ্য আচরণ সংশোধনের ব্যবস্থা। কোন কোন লোক খাওয়ার দাওয়াতে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে এমনভাবে ধরণা দিয়ে বসে চুটিয়ে আলাপ জুড়ে দেয় যে, আর উঠবার নামটি নেই, মনে হয় এ আলাপ আর শেষ হবে না। গৃহকর্তা ও গৃহবাসীদের এতে কি অসুবিধা হচ্ছে তার কোন পরোয়াই তারা করে না। ভদ্রতা জ্ঞান বিবর্জিত লোকেরা তাদের এ আচরণের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও কষ্ট দিতে থাকতো এবং তিনি নিজের ভদ্র ও উদার স্বভাবের কারণে এসব বরদাশ্ত করতেন। শেষে হযরত যয়নবের ওলিমার দিন এ কষ্টদায়ক আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যায়। নবী করীমের (সা) বিশেষ খাদেম হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাতের বেলা ছিল ওলিমার দাওয়াত। সাধারণ লোকেরা খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু দু' তিনজন লোক বসে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং পবিত্র স্ত্রীদের ওখান থেকে এক চক্কর দিয়ে এলেন। ফিরে এসে দেখলেন তাঁরা যথারীতি বসেই আছেন। তিনি আবার ফিরে গেলেন এবং হযরত আয়েশার কামরায় বসলেন। অনেকটা রাত অতিবাহিত হয়ে যাবার পর যখন তিনি জানলেন তাঁরা চলে গেছেন তখন তিনি হযরত যয়নবের (রা) কক্ষে গেলেন। এরপর এ বদ অভ্যাসগুলো সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া স্বয়ং আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়লো। হযরত আনাসের (রা) রেওয়ায়াত অনুযায়ী এ আয়াত সে সময়ই নাযিল হয়। (মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে জারীর)

৯৮. এ আয়াতকেই হিজাব বা পর্দার আয়াত বলা হয়। বুখারীতে হযরত আনাস ইবনে মালেকের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত উমর (রা) এ আয়াতটি নাযিল হবার

পূর্বে কয়েকবার নবী করীমের (সা) কাছে নিবেদন করেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার এখানে ভালোমন্দ সবরকম লোক আসে। আহা, যদি আপনি আপনার পবিত্র স্ত্রীদেরকে পর্দা করার হুকুম দিতেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, একবার হযরত উমর (রা) নবী করীমের (সা) স্ত্রীদের বলেন ঃ "যদি আপনাদের ব্যাপারে আমার কথা মেনে নেয়া হয় তাহলে আমার চোখ কখনোই আপনাদের দেখবে না।" কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আইন রচনার ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, তাই তিনি আল্লাহর ইশারার অপেক্ষায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এ হুকুম এসে গেলো যে, মাহ্রাম পুরুষরা ছাড়া (যেমন সামনের দিকে ৫৫ আয়াতে আসছে) অন্য কোন পুরুষ নবী করীমের (সা) গৃহে প্রবেশ করবে না। আর সেখানে মহিলাদের কাছে যারই কিছু কাজের প্রয়োজন হবে তাকে পর্দার পেছনে থেকেই কথা বলতে হবে। এ হুকুমের পরে পবিত্র স্ত্রীদের গৃহে দরোজার ওপর পর্দা লটকে দেয়া হয় এবং যেহেতু নবী করীমের (সা) গৃহ সকল মুসলমানের জন্য আদর্শগৃহ ছিল তাই সকল মুসলমানের গৃহের দরোজায়ও পর্দা ঝোলানো হয়। আয়াতের শেষ অংশ নিজেই এদিকে ইংগিত করছে যে, যারাই পুরুষ ও নারীদের মন পাক-পবিত্র রাখতে চায় তাদেরকে অবশ্যই এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

এখন যে ব্যক্তিকেই আল্লাহ দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন সে নিজেই দেখতে পারে, যে কিতাবটি নারী পুরুষকে সামনা সামনি কথা বলতে বাধা দেয় এবং পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার কারণ স্বরূপ একথা বলে যে, "তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশী উপযোগী", তার মধ্যে কেমন করে এ অভিনব প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করা যেতে পারে, যার ফলে নারী-পুরুষের মিশ্র সভা-সমিতি ও সহশিক্ষা এবং গণপ্রতিষ্ঠান ও অফিসসমূহে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা একেবারেই বৈধ হয়ে যাবে এবং এর ফলে মনের পবিত্রতা মোটেই প্রভাবিত হবে না? কেউ যদি কুরআনের বিধান অনুসরণ করতে না চায়, তাহলে সে তার বিরুদ্ধাচরণ করুক এবং পরিষ্কার বলে দিক আমি এর অনুসরণ করতে চাই না, এটিই তার জন্য অধিক যুক্তিসংগত পদ্ধতি। কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং তারপর আবার বেহায়ার মতো বুক ফুলিয়ে বলবে, এটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যা আমি উদ্ভাবন করে নিয়ে এসেছি—এটি বড়ই হীন আচরণ। কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন্ জায়গা থেকে তারা ইসলামের এ তথাকথিত শিক্ষা খুঁজে পেলেন?

৯৯. সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব অপবাদ ছড়ানো হচ্ছিল এবং কাফের ও মুনাফেকদের সাথে সাথে অনেক দুর্বল ঈমানদার মুসলমানও তাতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন, এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

১০০. সূরার শুরুতে "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ হচ্ছেন মু'মিনগণের মা" বলে যে বক্তব্য উপস্থাপন হয়েছে এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।

১০১. অর্থাৎ নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি যদি অন্তরেও কোন খারাপ ধারণা পোষণ করে অথবা তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্কে কারো নিয়তের মধ্যে কোন অসততা প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে তা গোপন থাকবে না এবং এ জন্যে সে শাস্তি পাবে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿۵۵﴾ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

নবীর স্ত্রীদের গৃহে তাদের বাপ, ছেলে, ভাই-ভাতিজা, ভাগ্না[১০২] সাধারণ মেলামেশার মহিলারা[১০৩] এবং তাদের মালিকানাধীন দাসদাসীরা[১০৪] এলে কোন ক্ষতি নেই। (হে নারীগণ!) তোমাদের আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকা উচিত। আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।[১০৫]

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান।[১০৬] হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।[১০৭]

১০২. ব্যাখ্যার জন্য সূরা নূরের তাফসীরের ৩৮ থেকে ৪২ পর্যন্ত টীকা দেখুন। এ প্রসংগে আল্লামা আলূসীর এ ব্যাখ্যাও উল্লেখযোগ্য যে, ভাই, ভাতিজা ও ভাগ্নাদের বিধানের মধ্যে এমন সব আত্মীয়রাও এসে যায় যারা একজন মহিলার জন্য হারাম—তারা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় বা দুধ সম্পর্কিত যাই হোক না কেন। এ তালিকায় চাচা ও মামার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তারা নারীর জন্য পিতার সমান। অথবা তাদের উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে এই যে, ভাতিজা ও ভাগ্নার কথা এসে যাবার পর তাদের কথা বলার প্রয়োজন নেই। কেননা ভাতিজা ও ভাগ্নাকে পর্দা না করার পেছনে যে কারণ রয়েছে চাচা ও মামাকে পর্দা না করার কারণও তাই। (রুহুল মা'আনী)

১০৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা নূরের তাফসীর ৪৩ টীকা।

১০৪. ব্যাখ্যার জন্য সূরা নূরের তাফসীরের ৪৪ টীকা দেখুন।

১০৫. একথার অর্থ হচ্ছে, এ চূড়ান্ত হুকুম এসে যাবার পর ভবিষ্যতে এমন কোন ব্যক্তিকে বেপর্দা অবস্থায় গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে না যে ঐ ব্যতিক্রমী আত্মীয়দের গণ্ডীর বাইরে অবস্থান করে। দ্বিতীয় অর্থ এও হয় যে, স্ত্রীদের কখনো এমন নীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যার ফলে স্বামীর উপস্থিতিতে তারা পর্দার নিয়ন্ত্রণ মেনে চলবে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়ের মাহরাম পুরুষদের সামনে পর্দা উঠিয়ে দেবে। তাদের এ কর্ম স্বামীর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না।

১০৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর প্রতি দরূদের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ নবীর প্রতি সীমাহীন করুণার অধিকারী। তিনি তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁর কাজে বরকত দেন। তাঁর নাম বুলন্দ করেন। তাঁর প্রতি নিজের রহমতের বারি বর্ষণ করেন। ফেরেশ্‌তাদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি দরূদের অর্থ হচ্ছে, তাঁরা তাঁকে চরমভাবে ভালোবাসেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ যেন তাঁকে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তাঁর শরীয়াতকে প্রসার ও বিস্তৃতি দান করেন এবং তাঁকে মাকামে মাহমূদ তথা সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে পৌছিয়ে দেন। পূর্বাপর বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিলে এ বর্ণনা পরম্পরায় একথা কেন বলা হয়েছে তা পরিষ্কার অনুভব করা যায়। তখন এমন একটি সময় ছিল যখন ইসলামের দুশমনরা এ সুস্পষ্ট জীবন ব্যবস্থার বিস্তার ও সম্প্রসারণের ফলে নিজেদের মনের আক্রোশ প্রকাশের জন্য নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে একের পর এক অপবাদ দিয়ে চলছিল এবং তারা নিজেরা একথা মনে করছিল যে, এভাবে কাঁদা ছিটিয়ে তারা তাঁর নৈতিক প্রভাব নির্মূল করে দেবে। অথচ এ নৈতিক প্রভাবের ফলে ইসলাম ও মুসলমানরা দিনের পর দিন এগিয়ে চলছিল। এ অবস্থায় আলোচ্য আয়াত নাযিল করে আল্লাহ দুনিয়াকে একথা জানিয়ে দেন যে, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরা আমার নবীর দুর্নাম রটাবার এবং তাঁকে অপদস্ত করার যতই প্রচেষ্টা চালাক না কেন শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হবে। কারণ আমি তাঁর প্রতি মেহেরবান এবং সমগ্র বিশ্ব–জাহানের আইন ও শৃংখলা ব্যবস্থা যেসব ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তারা সবাই তাঁর সহায়ক ও প্রশংসাকারী। আমি যেখানে তাঁর নাম বুলন্দ করছি। এবং আমার ফেরেশতারা তাঁর প্রশংসাবলীর আলোচনা করছে সেখানে তাঁর নিন্দাবাদ করে তারা কি লাভ করতে পারে? আমার রহমত ও বরকত তাঁর সহযোগী এবং আমার ফেরেশতারা দিনরাত দোয়া করছে, হে রব্বুল আলামীন! মুহাম্মাদের (সা) মর্যাদা আরো বেশী উঁচু করে দাও এবং তাঁর দীনকে আরো বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করো। এ অবস্থায় তারা তাদের বাজে অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর কি ক্ষতি করতে পারে?

১০৭. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, হে লোকেরা! মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর বদৌলতে তোমরা যারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছো তারা তাঁর মর্যাদা অনুধাবন করো এবং তাঁর মহা অনুগ্রহের হক আদায় করো। তোমরা মূর্খতার অন্ধকারে পথ ভুলে বিপথে চলছিলে, এ ব্যক্তি তোমাদের জ্ঞানের আলোক বর্তিকা দান করেছেন। তোমরা নৈতিক অধপতনের মধ্যে ডুবেছিলে, এ ব্যক্তি তোমাদের সেখান থেকে উঠিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে আজ মানুষ তোমাদেরকে ঈর্ষা করে। তোমরা বর্বর ও পাশবিক জীবন যাপন করছিলে, এ ব্যক্তি তোমাদের সর্বোত্তম মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাজে সুসজ্জিত করেছেন। তিনি তোমাদের ওপর এসব অনুগ্রহ করেছেন বলেই দুনিয়ার কাফের ও মুশরিকরা এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়ছে। নয়তো দেখো, তিনি কারো সাথে ব্যক্তিগতভাবে কোন দুর্ব্যবহার করেননি। তাই এখনি তোমাদের কৃতজ্ঞতার অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তারা এ আপাদমস্তক কল্যাণ ব্রতী ব্যক্তিত্বের প্রতি যে পরিমাণ হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে ঠিক একই পরিমাণ বরং তার চেয়ে বেশী ভালোবাসা তোমরা তাঁর প্রতি পোষণ করো। তারা তাঁকে যে পরিমাণ ঘৃণা করে ঠিক ততটাই বরং তার চেয়ে বেশীই তোমরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হবে। তারা তাঁর যতটা নিন্দা করে ঠিক ততটাই বরং তার চেয়ে বেশী তোমরা তাঁর প্রশংসা করো। তারা তাঁর যতটা

অশুভাকাংখী হয় তোমরা তাঁর ঠিক ততটাই বরং তার চেয়ে বেশী শুভাকাংখী হয়ে যাও এবং তাঁর পক্ষে সেই একই দোয়া করো যা আল্লাহর ফেরেশতারা দিনরাত তাঁর জন্য করে যাচ্ছে, হে দোজাহানের রব! তোমার নবী যেমন আমাদের প্রতি বিপুল অনুগ্রহ করেছেন তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি অসীম ও অগণিত রহমত বর্ষণ করো, তাঁর মর্যাদা দুনিয়াতেও সবচেয়ে বেশী উন্নত করো এবং আখেরাতেও তাঁকে সকল নৈকট্যলাভকারীদের চাইতেও বেশী নৈকট্য দান করো।

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে দু'টো জিনিসের হুকুম দেয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে, "সাল্লু আলাইহে" অর্থাৎ তাঁর প্রতি দরূদ পড়ো। অন্যটি হচ্ছে, "ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা" অর্থাৎ তাঁর প্রতি সালাম ও প্রশান্তি পাঠাও।

"সালাত" শব্দটি যখন "আলা" অব্যয় সহকারে বলা হয় তখন এর তিনটি অর্থ হয় : এক, কারো অনুরক্ত হয়ে পড়া, ভালোবাসা সহকারে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি ঝুঁকে পড়া। দুই, কারো প্রশংসা করা। তিন, কারো পক্ষে দোয়া করা। এ শব্দটি যখন আল্লাহর জন্য বলা হবে তখন একথা সুস্পষ্ট যে, তৃতীয় অর্থটির জন্য এটি বলা হবে না। কারণ আল্লাহর অন্য কারো কাছে দোয়া করার ব্যাপারটি একেবারেই অকল্পনীয়। তাই সেখানে অবশ্যই তা হবে শুধুমাত্র প্রথম দু'টি অর্থের জন্য। কিন্তু যখন এ শব্দ বান্দাদের তথা মানুষ ও ফেরেশ্তাদের জন্য বলা হবে তখন তা তিনটি অর্থেই বলা হবে। তার মধ্যে ভালোবাসার অর্থও থাকবে, প্রশংসার অর্থও থাকবে এবং দোয়া ও রহমতের অর্থও থাকবে। কাজেই মু'মিনদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে "সাল্লু আলাইহে"–এর হুকুম দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমরা তাঁর ভক্ত–অনুরক্ত হয়ে যাও তাঁর প্রশংসা করো এবং তাঁর জন্য দোয়া করো।

"সালাম" শব্দেরও দু'টি অর্থ হয়। এক সবরকমের আপদ বিপদ ও অভাব অনটন মুক্ত থাকা। এর প্রতিশব্দ হিসেবে আমাদের এখানে সালামতি বা নিরাপত্তা শব্দের ব্যবহার আছে, দুই, শান্তি, সন্ধি ও অবিরোধিতা। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে "সাল্লিমূ তাসলিমা" বলার একটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা তাঁর জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার দোয়া করো। আর এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা পুরোপুরি মনে প্রাণে তাঁর সাথে সহযোগিতা করো, তাঁর বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকো এবং তাঁর যথার্থ আদেশ পালনকারীতে পরিণত হও।

এ হুকুমটি নাযিল হবার পর বহু সাহাবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! সালামের পদ্ধতি তো আপনি আমাদের বলে দিয়েছেন। (অর্থাৎ নামাযে "আস্সালামু আলাইকা আইয়ুহান্ নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" এবং দেখা সাক্ষাত হলে "আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ" বলা।) কিন্তু আপনার প্রতি সালাত পাঠাবার পদ্ধতিটা কি? এর জবাবে নবী করীম (সা) বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন সময় যেসব দরূদ শিখিয়েছেন তা আমি নীচে উদ্ধৃত করছি :

কা'ব ইবনে 'উজ্রাহ (রা) থেকে :

اللّهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال

ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما

باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد -

এ দরূদটি সামান্য শাব্দিক বিভিন্নতা সহকারে হযরত কা'ব ইবনে উজ্‌রাহ (রা) থেকে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী শাইবাহ, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীরে উদ্ধৃত হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ঃ তাঁর থেকেও হালকা পার্থক্য সহকারে ওপরে বর্ণিত একই দরূদ উদ্ধৃত হয়েছে। (ইবনে জারীর)

আবু হুমাইদ সা'য়েদী (রা) থেকে ঃ

اللّهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم

وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم

انك حميد مجيد -

(মুআত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আবু মাসউদ বদরী (রা) থেকে ঃ

اللّهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم

وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت

على ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد -

(মালেক, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে ঃ

اللّهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم

وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم -

(আহমাদ, বুখারী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

বুরাইদাতাল খুযাঈ থেকে ঃ

اللّهم اجعل صلوتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد

كما جعلتها على ابراهيم انك حميد مجيد -

(আহমাদ, আব্‌দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মারদুইয়া)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে ঃ

اللّهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم ال ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد –

(নাসাঈ)

হযরত তাল্‌হা (রা) থেকে ঃ

اللّهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد –

(ইবনে জারীর)

এ দরূদগুলো শব্দের পার্থক্য সত্ত্বেও অর্থ সবগুলোর একই। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এ বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে।

প্রথমত এসবগুলোতে নবী করীম (সা) মুসলমানদেরকে বলেছেন, আমার ওপর দরূদ পাঠ করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহর কাছে এ মর্মে দোয়া করো। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের (সা) ওপর দরূদ পাঠাও। অজ্ঞ লোকেরা, যাদের অর্থজ্ঞান নেই, তারা সংগে সংগেই আপত্তি করে বসে যে, এতো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, আল্লাহ তো আমাদের বলছেন তোমরা আমার নবীর ওপর দরূদ পাঠ করো কিন্তু অপর দিকে আমরা আল্লাহকে বলছি তুমি দরূদ পাঠাও। অথচ এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে একথা বলেছেন যে, তোমরা আমার প্রতি "সালাতের" হক আদায় করতে চাইলেও করতে পারো না, তাই আল্লাহরই কাছে দোয়া চাও যেন তিনি আমার প্রতি দরূদ পাঠান। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, আমরা নবী করীমের (সা) মর্যাদা বুলন্দ করতে পারি না। আল্লাহই বুলন্দ করতে পারেন। আমরা নবী করীমের (সা) অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে পারি না। আল্লাহই তার প্রতিদান দিতে পারেন। আমরা নবী করীমের (সা) কথা আলোচনাকে উচ্চমাপে পৌঁছাবার এবং তাঁর দীনকে সম্প্রসারিত করার জন্য যতই প্রচেষ্টা চালাই না কেন আল্লাহর মেহেরবানী এবং তাঁর সুযোগ ও সহায়তা দান ছাড়া তাতে কোন প্রকার সাফল্য অর্জন করতে পারি না। এমন কি নবী করীমের (সা) প্রতি ভক্তি–ভালোবাসাও আমাদের অন্তরে আল্লাহরই সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অন্যথায় শয়তান নাজানি কতরকম প্ররোচনা দিয়ে আমাদের তাঁর প্রতি বিরূপ করে তুলতে পারে। اعاذنا اللّه من ذلك —আল্লাহ আমাদের তা থেকে বাঁচান। কাজেই নবী করীমের (সা) ওপর দরূদের হক আদায় করার জন্য আল্লাহর কাছে তাঁর প্রতি সালাত বা দরূদের দোয়া করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। যে ব্যক্তি "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন" বলে সে যেন আল্লাহর সমীপে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতে

গিয়ে বলে, হে আল্লাহ! তোমার নবীর ওপর সালাত বা দরূদ পাঠানোর যে কর্তব্য আমার ওপর চাপানো আছে তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ আমার নেই, আমার পক্ষ থেকে তুমিই তা সম্পন্ন করে দাও এবং তা করার জন্য আমাকে যেভাবে কাজে নিয়োগ করতে হয় তা তুমি নিয়োগ করো।

দ্বিতীয়ত নবী করীমের (সা) ভদ্রতা ও মহানুভবতার ফলে তিনি কেবল নিজেকেই এ দোয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে নেননি। বরং নিজের সাথে তিনি নিজের পরিজন স্ত্রী ও পরিবারকেও শামিল করে নিয়েছেন। স্ত্রী ও পরিবার অর্থ সুস্পষ্ট আর পরিজন শব্দটি নিছক নবী করীমের (সা) পরিবারের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং এর মধ্যে এমনসব লোকও এসে যায় যারা তাঁর অনুসারী এবং তাঁর পথে চলেন। পরিজন অর্থে মূলে "আল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার দৃষ্টিতে "আল" ও "আহল"–এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তির "আল" হচ্ছে এমন সব লোক যারা হয় তার সাথি, সাহায্যকারী ও অনুসারী, তারা তার আত্মীয় বা অনাত্মীয় হোক বা না হোক আর কোন ব্যক্তির "আহ্‌ল" হচ্ছে এমনসব লোক যারা তার সাথি ও অনুসারী হোক বা নাহোক অবশ্যই তার আত্মীয়। কুরআন মজীদের ১৪টি স্থানে "আলে ফেরাউন" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন জায়গায়ও "আহল" মানে ফেরাউনের পরিবারের লোকেরা নয়। বরং এমন সমস্ত লোক যারা হযরত মূসার মোকাবিলায় ফেরাউনের সমর্থক ও সহযোগী ছিল। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা বাকারার ৪৯–৫০, আলে 'ইমরানের ১১, আল আ'রাফের ১৩০ ও আল মু'মিনূনের ৪৬ আয়াতসমূহ) কাজেই এমন সমস্ত লোকই "আলে" মুহাম্মাদ (সা)–এর বহির্ভূত হয়ে যায় যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের অনুসারী নয়। চাই, তারা নবীর পরিবারের লোকই হোক না কেন। পক্ষান্তরে এমন সমস্ত লোকও এর অন্তরভুক্ত হয়ে যায় যারা নবী করীমের (সা) পদাংক অনুসরণ করে চলে, চাই তারা নবী করীমের (সা) কোন দূরবর্তী রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় নাই হোক। তবে নবী পরিবারের এমন প্রত্যেকটি লোক সর্বতোভাবেই 'আলে' মুহাম্মাদের (সা) অন্তরভুক্ত হবে যারা তাঁর সাথে রক্ত সম্পর্কও রাখে আবার তাঁর অনুসারীও।

তৃতীয় তিনি যেসব দরূদ শিখিয়েছেন তার প্রত্যেকটিতেই অবশ্যই একথা রয়েছে যে, তাঁর প্রতি এমন অনুগ্রহ করা হোক যা ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিজনদের ওপর করা হয়েছিল। এ বিষয়টি বুঝতে লোকদের বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আলেমগণ এর বিভিন্ন জটিল ব্যাখ্যা (তাবীল) করেছেন। কিন্তু কোন একটি ব্যাখ্যাও ঠিকমতো গ্রহণীয় নয়। আমার মতে এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, (অবশ্য আল্লাহই সঠিক জানেন) আল্লাহ হযরত ইবরাহীমের প্রতি একটি বিশেষ করুণা করেন। আজ পর্যন্ত কারো প্রতি এ ধরনের করুণা প্রদর্শন করেননি। আর তা হচ্ছে এই যে, যারা নবুওয়াত, অহী ও কিতাবকে হিদায়াতের উৎস বলে মেনে নেয় তারা সবাই হযরত ইবরাহীমের (আ) নেতৃত্বের প্রশ্নে একমত। এ ব্যাপারে মুসলমান, খৃস্টান ও ইহুদির মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, যেভাবে হযরত ইবরাহীমকে মহান আল্লাহ সমস্ত নবীর অনুসারীদের নেতায় পরিণত করেছেন। অনুরূপভাবে আমাকেও পরিণত করুন। এমন কোন ব্যক্তি যে নবুওয়াত মেনে নিয়েছে সে যেন আমার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত না হয়।

নবী করীমের (সা) প্রতি দরূদ পড়া ইসলামের সুন্নাত। তাঁর নাম উচ্চারিত হলে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। বিশেষ করে নামাযে দরূদ পড়া সুন্নাত। এ বিষয়ে সমগ্র আলেম সমাজ একমত। সমগ্র জীবনে নবী (সা)-এর প্রতি একবার দরূদ পড়া ফরয, এ ব্যাপারে 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারণ আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু এরপর দরূদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছে।

ইমাম শায়েঈ (র) বলেন, নামাযে একজন মুসল্লী যখন শেষ বার তাশাহ্হুদ পড়ে তখন সেখানে সালাতুন আলান নবী (صلوة على النبى) পড়া ফরয। কোন ব্যক্তি এভাবে না পড়লে তার নামায হবে না। সাহাবীগণের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), তাবেঈদের মধ্য থেকে শা'বী, ইমাম মুহাম্মাদ বাকের, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরযী ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান এবং ফকীহগণের মধ্য থেকে ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহও এ মতের প্রবক্তা ছিলেন। শেষের দিকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলও এ মত অবলম্বন করেন।

ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালেক (র) ও অধিকাংশ উলামা এ মত পোষণ করেন যে, দরূদ সারা জীবনে শুধুমাত্র একবার পড়া ফরয। এটি কালেমায়ে শাহাদাতের মতো। যে ব্যক্তি একবার আল্লাহকে ইলাহ বলে মেনে নিয়েছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের স্বীকৃতি দিয়েছে সে ফরয আদায় করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে যে একবার দরূদ পড়ে নিয়েছে সে নবীর ওপর সালাত পাঠ করার ফরয আদায়ের দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছে। এরপর তার ওপর আর কালেমা পড়া ফরয নয় এবং দরূদ পড়াও ফরয নয়।

একটি দল নামাযে দরূদ পড়াকে সকল অবস্থায় ওয়াজিব গণ্য করেন। কিন্তু তাঁরা তাশাহ্হুদের সাথে তাকে শৃংখলিত করেন না।

অন্য একটি দলের মতে প্রত্যেক দোয়ায় দরূদ পড়া ওয়াজিব। আরো কিছু লোক নবী করীমের (সা) নাম এলে দরূদ পড়া ওয়াজিব বলে অভিমত পোষণ করেন। অন্য একটি দলের মতে এক মজলিসে নবী করীমের (সা) নাম যতবারই আসুক না কেন দরূদ পড়া কেবলমাত্র একবারই ওয়াজিব।

কেবলমাত্র ওয়াজিব হবার ব্যাপারে এ মতবিরোধ। তবে দরূদের ফযীলত, তা পাঠ করলে প্রতিদান ও সওয়াব পাওয়া এবং তার একটি অনেক বড় সৎকাজ হবার ব্যাপারে তো সমস্ত মুসলিম উম্মাত একমত। যে ব্যক্তি ঈমানের সামান্যতম স্পর্শও লাভ করেছে তার এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। এমন প্রত্যেকটি মুসলমানের অন্তর থেকেই তো স্বাভাবিকভাবে দরূদ বের হবে যার মধ্যে এ অনুভূতি থাকবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পরে আমাদের প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী। মানুষের দিলে ঈমান ও ইসলামের মর্যাদা যত বেশী হবে তত বেশী মর্যাদা হবে তার দিলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহেরও। আর মানুষ যত বেশী এ অনুগ্রহের কদর করতে শিখবে তত বেশীই সে নবী করীমের (সা) ওপর দরূদ পাঠ করবে। কাজেই বেশী বেশী দরূদ পড়া হচ্ছে একটি মাপকাঠি। এটি পরিমাপ করে জানিয়ে দেয়

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা গভীর এবং ঈমানের নিয়ামতের কতটা কদর তার অন্তরে আছে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من صلى على صلواة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে ফেরেশ্‌তারা তার প্রতি দরূদ পাঠ করে যতক্ষণ সে দরূদ পাঠ করতে থাকে।" (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)

من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا

"যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার ওপর দশবার দরূদ পড়েন।" (মুসলিম)

اولى الناس بى يوم القيامة اكثرهم على صلواة (ترمذى)

"কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকার সবচেয়ে বেশী হকদার হবে সেই ব্যক্তি যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়বে।" (তিরমিযী)

البخيل الذى ذكرت عنده فلم يصل على (ترمذى)

"আমার কথা যে ব্যক্তির সামনে আলোচনা করা হয় এবং সে আমার ওপর দরূদ পাঠ করে না সে কৃপণ।" (তিরমিযী)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যের জন্য اللهم صل على فلان অথবা صلى الله عليه وسلم কিংবা এ ধরনের অন্য শব্দ সহকারে 'সালাত' পেশ করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একটি দল, কাযী ঈয়াযের নাম এ দলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একে সাধারণভাবে জায়েয মনে করে। এদের যুক্তি হচ্ছে, কুরআনে আল্লাহ নিজেই অ-নবীদের ওপর একাধিক জায়গায় সালাতের কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। যেমন,

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (البقره : ١٥٧)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (التوبه : ١٠٣)

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ (الاحزاب : ٤٣)

এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একাধিকবার অ-নবীদের জন্য সালাত শব্দ সহকারে দোয়া করেন। যেমন একজন সাহাবীর জন্য তিনি দোয়া করেন اللهم صل على ال ابى اوفى (হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিজনদের ওপর সালাত পাঠাও) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) স্ত্রীর আবেদনের জবাবে বলেন, صلى الله

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝٥٧ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝٥٨

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।[১০৮] আর যারা মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কোন অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয় তারা একটি বড় অপবাদ[১০৯] ও সুস্পষ্ট গোনাহর বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে।

عليك وعلى زوجك (আল্লাহ তোমার ও তোমার স্বামীর ওপর সালাত পাঠান)। যারা যাকাত নিয়ে আসতেন তাদের পক্ষে তিনি বলতেন, اللهم صل عليهم (হে আল্লাহ ওদের ওপর সালাত পাঠাও)। হযরত সা'দ ইবনে উবাদার পক্ষে তিনি বলেন, اللهم اجعل صلوتك ورحمتك على ال سعد بن عباده (হে আল্লাহ! সা'দ ইবনে উবাদার (রা) পরিজনদের ওপর তোমার সালাত ও রহমত পাঠাও)। আবার মু'মিনের রূহ সম্পর্কে নবী করীম (সা) খবর দিয়েছেন যে, ফেরেশ্‌তারা তার জন্য দোয়া করে ঃ صلى الله عليك وعلى جسدك কিন্তু মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের মতে এমনটি করা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য তো সঠিক ছিল কিন্তু আমাদের জন্য সঠিক নয়। তারা বলেন, সালাত ও সালামকে মুসলমানরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। এটি বর্তমানে তাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। তাই নবীদের ছাড়া অন্যদের জন্য এগুলো ব্যবহার না করা উচিত। এ জন্যই হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয একবার নিজের একজন শাসনকর্তাকে লিখেছিলেন, "আমি শুনেছি কিছু বক্তা এ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে শুরু করেছেন যে, তাঁরা 'সালাতু আলান নাবী'–এর মতো নিজেদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারীদের জন্যও "সালাত" শব্দ ব্যবহার করছেন। আমার এ পত্র পৌঁছে যাবার পরপরই তাদেরকে এ কাজ থেকে নিরস্ত করো এবং সালাতকে একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য মুসলমানদের জন্য দোয়া করেই ক্ষান্ত হবার নির্দেশ দাও।" (রূহুল মা'আনী) অধিকাংশ আলেম এ মতও পোষণ করেন যে, নবী করীম (সা) ছাড়া অন্য কোন নবীর জন্যও "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" ব্যবহার করা সঠিক নয়।

১০৮. আল্লাহকে কষ্ট দেবার অর্থ হয় দু'টি জিনিস। এক, তাঁর নাফরমানি করা। তাঁর মোকাবিলায় কুফরী, শির্‌ক ও নাস্তিক্যবাদের পথ অবলম্বন করা। তিনি যা হারাম করেছেন তাকে হালাল করা। দুই, তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়া কারণ রসূলের আনুগত্য যেমন আল্লাহর আনুগত্য ঠিক তেমনি রসূলের নিন্দাবাদ আল্লাহর নিন্দাবাদের শামিল। রসূলের বিরোধিতা আল্লাহর বিরোধিতার সমার্থক। রসূলের নাফরমানি আল্লাহরই নাফরমানি।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

৮ রুকূ'

হে নবী! তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দাও তারা *যেন তাদের চাদরের প্রান্ত তাদের ওপর টেনে নেয়।*[১১০] *এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং কষ্ট না দেয়া হয়।*[১১১] *আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*[১১২]

১০৯. এ আয়াতটি অপবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে দোষ নেই অথবা যে অপরাধ মানুষ করেনি তা তার ওপর আরোপ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, গীবত কি? জবাবে বলেন ঃ ذكرك اخاك بما يكره "তোমার নিজের ভাইয়ের আলোচনা এমনভাবে করা যা সে অপছন্দ করে।" জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই দোষ সত্যিই থেকে থাকে? জবাব দেন ঃ

ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ماتقول فقد بهته

"তুমি যে দোষের কথা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তার ওপর অপবাদ দিলে।"

এ কাজটি কেবলমাত্র একটি নৈতিক গোনাহই নয়, আখেরাতে যার শাস্তি পাওয়া যাবে বরং এ আয়াতের দাবী হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের আইনেও মিথ্যা অপবাদ দান করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করতে হবে।

১১০. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ আরবী ভাষায় 'জিলবাব' বলা হয় বড় চাদরকে। আর ইদ্‌নি (ادناء) শব্দের আসল মানে হচ্ছে নিকটবর্তী করা ও ঢেকে নেয়া। কিন্তু যখন তার সাথে 'আলা' অব্যয় (Preposition) বসে তখন তার মধ্যে ইরখা (ارخاء) অর্থাৎ ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগের কোন কোন অনুবাদক ও তাফসীরকার পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এ শব্দের অনুবাদ করেন শুধুমাত্র "জড়িয়ে নেয়া" যাতে চেহারা কোনভাবে ঢেকে রাখার হুকুমের বাইরে থেকে যায়। কিন্তু যা বর্ণনা করছেন আল্লাহর উদ্দেশ্য যদি তাই হতো, তাহলে তিনি يُدْنِيْنَ اِلَيْهِنَّ বলতেন। যে ব্যক্তিই আরবী ভাষা জানেন তিনি কখনো একথা মেনে নিতে পারেন না যে, يدنين عليهن মানে কেবলমাত্র জড়িয়ে নেয়া হতে পারে।

তাছাড়া مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ শব্দ দু'টি এ অর্থ গ্রহণ করার পথে আরো বেশী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে মিন (مِنْ) শব্দটি "কিছু" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ চাদরের এক অংশ। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, জড়িয়ে নিতে হলে পুরো চাদর জড়াতে হবে, নিছক তার একটা অংশ নয়। তাই আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, নারীরা যেন নিজেদের চাদর ভালোভাবে জড়িয়ে ঢেকে নিয়ে তার একটি অংশ বা একটি পাল্লা নিজেদের ওপর লটকিয়ে দেয়, সাধারণভাবে যাকে বলা হয় ঘোমটা।

নবুওয়াত যুগের নিকটবর্তী কালের প্রধান মুফাস্সিরগণ এর এ অর্থই বর্ণনা করেন। ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযিরের বর্ণনা মতে মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (র) হযরত উবাইদাতুস সালমানীর কাছে এ আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞেস করেন। (এই হযরত উবাইদাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুসলমান হন কিন্তু তাঁর খিদমতে হাযির হতে পারেননি। হযরত উমরের (রা) আমলে তিনি মদীনা আসেন এবং সেখানেই থেকে যান। তাঁকে ফিক্হ ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে কাযী শুরাইহ–এর সমকক্ষ মনে করা হতো।) তিনি জবাবে কিছু বলার পরিবর্তে নিজের চাদর তুলে নেন এবং তা দিয়ে এমনভাবে মাথা ও শরীর ঢেকে নেন যে তার ফলে পুরো মাথা ও কপাল এবং পুরো চেহারা ঢাকা পড়ে যায়, কেবলমাত্র একটি চোখ খোলা থাকে। ইবনে আব্বাসও প্রায় এই একই ব্যাখ্যা করেন। তাঁর যেসব উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে তাঁর যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ মহিলাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, যখন তারা কোন কাজে ঘরের বাইরে বের হবে তখন নিজেদের চাদরের পাল্লা ওপর দিয়ে লটকে দিয়ে যেন নিজেদের মুখ ঢেকে নেয় এবং শুধুমাত্র চোখ খোলা রাখে।" কাতাদাহ ও সুদ্দীও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

সাহাবা ও তাবে'ঈদের যুগের পর ইসলামের ইতিহাসে যত বড় বড় মুফাস্সির অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা সবাই একযোগে এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন ঃ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ অর্থাৎ ভদ্র ঘরের মেয়েরা যেন নিজেদের পোশাক আশাকে বাঁদীদের মতো সেজে ঘর থেকে বের না হয়। তাদের চেহারা ও কেশদাম যেন খোলা না থাকে। বরং তাদের নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়া উচিত। ফলে কোন ফাসেক তাদেরকে উত্যক্ত করার দুঃসাহস করবে না। (জামে'উল বায়ান, ২২ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আবু বকর জাস্সাস বলেন, "এ আয়াতটি প্রমাণ করে, যুবতী মেয়েদের চেহারা অপরিচিত পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই সাথে ঘর থেকে বের হবার সময় তাদের 'সতর' ও পবিত্রতা সম্পন্না হবার কথা প্রকাশ করা উচিত। এর ফলে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী লোকেরা তাদেরকে দেখে কোন প্রকার লোভ ও লালসার শিকার হবে না।" (আহকামুল কুরআন, ৩ খণ্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা যামাখ্শারী বলেন, يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ অর্থাৎ তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের একটি অংশ লটকে নেয় এবং তার সাহায্যে নিজেদের চেহারা ও প্রান্তভাগগুলো ভালোভাবে ঢেকে নেয়।" (আল কাশ্শাফ, ২ খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী বলেন, يدنين عليهن من جلابيبهن অর্থাৎ নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়। এভাবে মেয়েদেরকে মাথা ও চেহারা ঢাকার হুকুম দেয়া হয়েছে। (গারায়েবুল কুরআন, ২২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

ইমাম রাযী বলেন ঃ "এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা যেন জানতে পারে এরা দুশ্চরিত্রা মেয়ে নয়। কারণ যে মেয়েটি নিজের চেহারা ঢাকবে, অথচ চেহারা সতরের অন্তরভুক্ত নয়, তার কাছে কেউ আশা করতে পারে না যে, সে নিজের 'সতর' অন্যের সামনে খুলতে রাজী হবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, এ মেয়েটি পর্দানশীন, একে যিনার কাজে লিপ্ত করার আশা করা যেতে পারে না।" (তাফসীরে কবীর, ২ খণ্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা)

এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে আর একটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ এখান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি কন্যা থাকার কথা প্রমাণিত হয়। কারণ, আল্লাহ বলছেন, "হে নবী! তোমার স্ত্রীদের ও কন্যাদেরকে বলো।" এ শব্দাবলী এমনসব লোকদের উক্তি চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করে যারা আল্লাহর ভয়শূন্য হয়ে নিসংকোচে এ দাবী করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেবলমাত্র একটি কন্যা ছিল এবং তিনি ছিলেন হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। বাদ বাকি অন্য কন্যারা তাঁর ঔরসজাত ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন তাঁর স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত এবং তাঁর কাছে প্রতিপালিত। এ লোকেরা বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে একথাও চিন্তা করেন না যে, নবী সন্তানদেরকে তাঁর ঔরসজাত হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করে তারা কতবড় অপরাধ করছেন এবং আখেরাতে এ জন্য তাদেরকে কেমন কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস এ ব্যাপারে ঐকমত্য ব্যক্ত করেছে যে, হযরত খাদীজার (রা) গর্ভে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কেবলমাত্র একটি সন্তান হযরত ফাতেমা (রা) জন্মগ্রহণ করেননি বরং আরো তিন কন্যাও জন্মলাভ করে। নবী করীমের (সা) সবচেয়ে প্রাচীন সীরাত লেখক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক হযরত খাদীজার সাথে নবী করীমের (সা) বিয়ের ঘটনা উল্লেখ করার পর বলেন ঃ "ইবরাহীম ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত ছেলে মেয়ে তাঁরই গর্ভে জন্ম নেয়। তাদের নাম হচ্ছে ঃ কাসেম, তাহের ও তাইয়েব এবং যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা) প্রখ্যাত বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব কাল্‌বির বর্ননা হচ্ছে ঃ "নবুওয়াত লাভের পূর্বে মক্কায় জম্মগ্রহণকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম সন্তান হলো কাসেম। তারপর জম্মলাভ করে যয়নব, তারপর রুকাইয়া, তারপর উম্মে কুলসুম।" (তাবকাতে ইবনে সা'দ, ১ খণ্ড, ১৩৩পৃষ্ঠা) ইবনে হাযম জাওয়ামেউস সিয়ারে লিখেছেন, হযরত খাদীজার (রা) গর্ভে নবী করীমের (সা) চারটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন হযরত যয়নব (রা), তাঁর ছোট ছিলেন হযরত রুকাইয়া (রা), তাঁর ছোট ছিলেন হযরত ফাতেমা (রা) এবং তাঁর ছোট ছিলেন হযরত উম্মে কুলসুম (রা)। (পৃষ্ঠা ৩৮—৩৯) তাবারী, ইবনে সা'দ আল মুহাব্বার গ্রন্থ প্রণেতা আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে হাবীব এবং আল ইস্‌তি'আব গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে আবদুল বার নির্ভরযোগ্য বরাতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে হযরত খাদীজার (রা) আরো দু'জন স্বামী অতিক্রান্ত হয়েছিল। একজন ছিলেন আবু হালাহ তামিমী, তাঁর ঔরসে জন্ম নেয় হিন্দ

ইবনে আবু হালাহ। দ্বিতীয় জন ছিলেন আতীক ইবনে আয়েদ মাখযূমী। তাঁর ঔরসে হিন্দ নামে এক মেয়ের জন্ম হয়। তারপর তাঁর বিয়ে হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে। সকল বংশ তালিকা বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে তাঁর ঔরসে হযরত খাদীজার (রা) গর্ভে ওপরে উল্লেখিত চার কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। (দেখুন তাবারী, ২ খণ্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা; তাবকাত ইবনে সা'দ, ৮ খণ্ড, ১৪—১৬ পৃষ্ঠা, কিতাবুল মুহাব্বার, ৭৮,৭৯ ও ৪৫২ পৃষ্ঠা এবং আল ইসতি'আব, ২ খণ্ড, ৭১৮ পৃষ্ঠা।) এ সমস্ত বর্ণনা নবী করীমের (সা) একটি নয় বরং কয়েকটি মেয়ে ছিল, কুরআন মজীদের এ বর্ণনাকে অকাট্য প্রমাণ করে।

১১১. "চিনে নেয়া যায়'' এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে এ ধরনের অনারাড়ম্বর লজ্জা নিবারণকারী পোশাকে সজ্জিত দেখে প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী জানবে তারা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পূত-পবিত্র মেয়ে, এমন ভবঘুরে অসতী ও পেশাদার মেয়ে নয়, কোন অসদাচারী মানুষ যার কাছে নিজের কামনা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। "না কষ্ট দেয়া হয়'' এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যেন উত্যক্ত ও জ্বালাতন না করা হয়।

এখানে কিছুক্ষণ থেমে একবার একথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করুন যে, কুরআনের এ হুকুম এবং এ হুকুমের যে উদ্দেশ্য আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন তা ইসলামী সমাজ বিধানের কোন ধরনের প্রাণ শক্তির প্রকাশ ঘটাচ্ছে। ইতিপূর্বে সূরা নূরের ৩১ আয়াতে এ নির্দেশ আলোচিত হয়েছে যে, মহিলারা তাদের সাজসজ্জা অমুক অমুক ধরনের পুরুষ ও নারীদের ছাড়া আর কারো সামনে প্রকাশ করবে না। "আর মাটির ওপর পা দাপিয়ে চলবে না, যাতে যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে লোকেরা যেন তা জেনে না ফেলে।" এ হুকুমের সাথে যদি সূরা আহ্‌যাবের এ আয়াতটি মিলিয়ে পড়া হয় তাহলে পরিষ্কার জানা যায় যে, এখানে চাদর দিয়ে ঢাকার যে হুকুম এসেছে অপরিচিতদের থেকে সৌন্দর্য লুকানোই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন চাদরটি হবে সাদামাটা। নয়তো একটি উন্নত নকশাদার ও দৃষ্টিনন্দন কাপড় জড়িয়ে নিলে তো উলটো এ উদ্দেশ্য আরো খতম হয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ কেবল চাদর জড়িয়ে সৌন্দর্য ঢেকে রাখার হুকুম দিচ্ছেন না বরং একথাও বলছেন যে, মহিলারা যেন চাদরের একটি অংশ নিজেদের ওপর লটকে দেয়। কোন বিচক্ষণ বিবেকবান ব্যক্তি এ উক্তিটির এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন অর্থ করতে পারেন না যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘোমটা দেয়া, যাতে শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য ঢাকার সাথে সাথে চেহারাও ঢাকা পড়বে। তারপর আল্লাহ নিজেই এ হুকুমটির 'ইল্লাত' (কার্যকারণ) এ বর্ণনা করেছেন যে, এটি এমন একটি সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি যা থেকে মুসলমান মহিলাদেরকে চিনে নেয়া যাবে এবং তারা উত্যক্ত হবার হাত থেকেও বেঁচে যাবে। এ থেকে আপনা-আপনিই একথা প্রকাশ হয়ে যায় যে, এ নির্দেশ এমন সব মহিলাকে দেয়া হচ্ছে যারা পুরুষদের হাতে উত্যক্ত হবার এবং তাদের দৃষ্টিতে পড়ার ও তাদের কামনা-লালসার বস্তুতে পরিণত হবার ফলে আনন্দ অনুভব করার পরিবর্তে একে নিজেদের জন্য কষ্টদায়ক ও লাঞ্ছনাকর মনে করে, যারা সমাজে নিজেদেরকে বে-আবরু মক্ষিরাণী ধরনের মহিলাদের মধ্যে গণ্য করাতে চায় না। বরং সতী-সাধ্বী গৃহ প্রদীপ হিসেবে পরিচিত হতে চায়। এ ধরনের শরীফ ও পূত চরিত্রের অধিকারিনী সৎকর্মশীলা মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যদি সত্যিই তোমরা এভাবে নিজেদেরকে পরিচিত করাতে চাও এবং পুরুষদের যৌন লালসার দৃষ্টি সত্যিই

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

যদি মুনাফিকরা এবং যাদের মনে গলদ[১১৩] আছে তারা আর যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়ায়,[১১৪] তারা নিজেদের তৎপরতা থেকে বিরত না হয়, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার জন্য তোমাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো; তারপর খুব কমই তারা এ নগরীতে তোমার সাথে থাকতে পারবে। তাদের ওপর লানত বর্ষিত হবে চারদিক থেকে, যেখানেই পাওয়া যাবে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। এটিই আল্লাহর সুন্নাত, এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে পূর্ব থেকে এটিই চলে আসছে এবং তুমি আল্লাহর সুন্নাতে কোন পরিবর্তন পাবে না।[১১৫]

তোমাদের জন্য আনন্দদায়ক না হয়ে কষ্টকর হয়ে থাকে, তাহলে এ জন্য তোমরা খুব ভালোভাবে সাজসজ্জা করে বাসর রাতের কনে সেজে ঘর থেকে বের হয়ো না এবং দর্শকদের লালসার দৃষ্টির সামনে নিজেদের সৌন্দর্যকে উজ্জল করে তুলে ধরো না। কেননা এটা এর উপযোগী পদ্ধতি নয়। বরং এ জন্য সর্বাধিক উপযোগী পদ্ধতি এই হতে পারে যে, তোমরা একটি সাদামাটা চাদরে নিজেদের সমস্ত সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা ঢেকে বের হবে, চেহারা ঘোমটার আড়ালে রাখবে এবং এমনভাবে চলবে যাতে অলংকারের রিনিঝিনি আওয়াজ লোকদেরকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে না। বাইরে বের হবার আগে যেসব মেয়ে সাজগোজ করে নিজেদেরকে তৈরী করে এবং ততক্ষণ ঘরের বাইরে পা রাখে না যতক্ষণ অপরূপ সাজে নিজেদেরকে সজ্জিতা না করে নেয়, তাদের এর উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তারা সারা দুনিয়ার পুরুষদের জন্য নিজেদেরকে দৃষ্টিনন্দন করতে চায় এবং তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়। এরপর যদি তারা বলে, দর্শকদের ভ্রূভংগী তাদেরকে কষ্ট দেয়, এরপর যদি তাদের দাবী হয় তারা "সমাজের মক্ষিরাণী" এবং "সর্বজনপ্রিয় মহিলা" হিসেবে নিজেদেরকে চিত্রিত করতে চায় না বরং পূত–পবিত্রা গৃহিনী হয়েই থাকতে চায়, তাহলে এটা একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের কথা তার নিয়ত নির্ধারণ করে না বরং কাজই তার আসল নিয়ত প্রকাশ করে। কাজেই যে নারী আকর্ষণীয়া হয়ে পর পুরুষের সামনে যায়, তার এ কাজটির পেছনে কোন্

ধরনের উদ্দেশ্য কাজ করছে সেটা ঐ কাজ দ্বারাই প্রকাশ পায়। কাজেই এসব মহিলাদের থেকে যা আশা করা যেতে পারে ফিত্‌নাবাজ লোকেরা তাদের থেকে তাই আশা করে থাকে। কুরআন মহিলাদেরকে বলে, তোমরা একই সংগে "গৃহপ্রদীপ" ও "সমাজের মক্ষিরাণী" হতে পারো না। গৃহপ্রদীপ হতে চাইলে সমাজের মক্ষিরানী হবার জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তা পরিহার করো এবং এমন জীবনধারা অবলম্বন করো যা গৃহপ্রদীপ হতে সাহায্য করতে পারে। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মত কুরআনের অনুকূল হোক বা তার প্রতিকূল এবং তিনি কুরআনের পথনির্দেশকে নিজের কর্মনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে চান বা না চান, মোটকথা তিনি যদি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জাল–জুয়াচুরির পথ অবলম্বন করতে না চান, তাহলে কুরআনের অর্থ বুঝতে তিনি ভুল করতে পারেন না। তিনি যদি মুনাফিক না হয়ে থাকেন, তাহলে পরিষ্কারভাবে একথা মেনে নেবেন যে, ওপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাই হচ্ছে কুরআনের উদ্দেশ্য। এরপর তিনি যে বিরুদ্ধাচরণই করবেন একথা মেনে নিয়েই করবেন যে, তিনি কুরআন বিরোধী কাজ করছেন অথবা কুরআনের নির্দেশনাকে ভুল মনে করছেন।

১১২. অর্থাৎ ইতিপূর্বে জাহেলী জীবন যাপন করার সময় যেসব ভুল করা হয় আল্লাহ নিজ মেহেরবানীতে তা ক্ষমা করে দেবেন তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে, এখন পরিষ্কার পথনির্দেশ লাভ করার পর তোমরা নিজেদের কর্মধারা সংশোধন করে নেবে এবং জেনে বুঝে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

১১৩. "মনের গলদ" বলতে এখানে দু'ধরনের গলদের কথা বলা হয়েছে। এক, মানুষ নিজেকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করা সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলমানদের অশুভাকাংখী হয়। দুই, মানুষ অসৎ সংকল্প, লাম্পট্য ও অপরাধী মানসিকতার আশ্রয় নেয়। এবং তার পূতিগন্ধময় প্রবণতাগুলো তার উদ্যোগ, আচরণ ও কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

১১৪. এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ও আতংক ছড়াবার এবং তাদের মনোবল ভেংগে দেবার জন্য সে সময় প্রতি দিন মদীনায় এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে বেড়াতো যে, অমুক জায়গায় মুসলমানরা খুব বেশী মার খেয়ে গেছে, অমুক জায়গায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপুল শক্তিশালী সমাবেশ ঘটছে এবং শিগ্‌গির মদীনার ওপর অতর্কিত হামলা হবে। এই সংগে তাদের আর একটি কাজ এও ছিল যে, তারা নবীর পরিবার ও শরীফ মুসলমানদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অলীক গল্প তৈরি করে সেগুলো ছড়াতে থাকতো, যাতে এর ফলে জনগণের মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি হয় এবং মুসলমানদের নৈতিক প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১১৫. অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়াতের একটি স্বতন্ত্র বিধান আছে। সে বিধান হচ্ছে, একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে এ ধরনের ফাসাদীদেরকে কখনো সমৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া হয় না। যখনই কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা আল্লাহর শরীয়াতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে এ ধরনের লোকদেরকে পূর্বেই সতর্ক করে দেয়া হবে, যাতে তারা নিজেদের নীতি পরিবর্তন করে নেয় এবং তারপর তারা বিরত না হলে কঠোরভাবে তাদেরকে দমন করা হবে।

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামত কবে আসবে?[১১৬] বলো, একমাত্র আল্লাহই এর জ্ঞান রাখেন। তুমি কী জানো, হয়তো তা নিকটেই এসে গেছে। মোটকথা এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অভিসপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য উৎক্ষিপ্ত আগুনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল, কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের চেহারা আগুনে ওলট পালট করা হবে তখন তারা বলবে "হায়! যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতাম।" আরো বলবে, "হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লানত বর্ষণ করো।"[১১৭]

১১৬. সাধারণত কাফের ও মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের প্রশ্ন করতো। এর মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করা তাদের উদ্দেশ্য হতো না। বরং তারা ঠাট্টা–মস্করা ও তামাশা–বিদ্রূপ করার জন্য একথা জিজ্ঞেস করতো। আসলে তারা আখেরাতে বিশ্বাস করতো না। কিয়ামতের ধারণাকে তারা নিছক একটি অন্তসারশূন্য হুমকি মনে করতো। কিয়ামত আসার আগে তারা নিজেদের যাবতীয় বিষয় ঠিকঠাক করে নেবার ইচ্ছা রাখে বলেই যে তারা তার আসার তারিখ জিজ্ঞেস করতো তা নয়। বরং তাদের আসল উদ্দেশ্য এই হতো, "হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা তোমাকে ছোট করার জন্য এসব করেছি এবং আজ পর্যন্ত তুমি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারোনি। এখন তাহলে তুমি আমাদের বলো, সেই কিয়ামত কবে হবে যখন আমাদের শাস্তি দেয়া হবে।"

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

৯ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ![১১৮] তাদের মতো হয়ে যেয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদের তৈরি করা কথা থেকে তাকে দায়মুক্ত করেন এবং সে আল্লাহর কাছে ছিল সম্মানিত।[১১৯] হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে বড় সাফল্য অর্জন করে।

১১৭. এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের বহুস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত স্থানগুলো দেখুন ঃ আল আ'রাফ ১৮৭, আন নাযি'আত ৪২ ও ৪৬, সাবা ৩ ও ৫, আল মুল্‌ক ২৪ ও ২৭, আল মুতাফ্‌ফিফীন ১০ ও ১৭, আল হিজ্‌র ২ ও ৩, আল ফুরকান ২৭ ও ২৯ এবং হা-মীম আস সাজদাহ ২৬ ও ২৯ আয়াত।

১১৮. মনে রাখতে হবে, কুরআন মজীদে "হে ঈমানদারগণ।" শব্দাবলীর মাধ্যমে কোথাও তো সাচ্চা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে আবার কোথাও মুসলমানদের দলকে সামগ্রিকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যার মধ্যে মু'মিন, মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার সবাই শামিল আছে। আবার কোথাও মুনাফিকদের দিকে কথার মোড় ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদারদেরকে যখনই الذين امنوا বলে সম্বোধন করা হয় তখন এর উদ্দেশ্য তাদেরকে লজ্জা দেয়া এই মর্ম যে, তোমরা তো ঈমান আনার দাবী করে থাকো আর এই হচ্ছে তোমাদের কাজ। আগের পিছের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেক জায়গায় الذين امنوا বলে কোন্ জায়গায় কার কথা বলা হয়েছে তা সহজেই জানা যায়। এখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা পরিষ্কার জানাচ্ছে যে, এখানে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

১১৯. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, "হে মুসলমানরা! তোমরা ইহুদিদের মতো করো না। মূসা আলাইহিস সালামের সাথে বনী ইসরাঈল যে আরচণ করে তোমাদের নবীর সাথে তোমাদের তেমনি ধরনের আচরণ করা উচিত নয়।" বনী ইসরাঈল নিজেরাই একথা স্বীকার করে যে, হযরত মূসা ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় অনুগ্রাহক ও উপকারী। এ জাতির যা কিছু উন্নতি অগ্রগতি সব তাঁরই বদৌলতে। নয়তো মিসরে তাদের পরিণতি

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

আমি এ আমানতকে অকাশসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতরাজির ওপর পেশ করি, তারা একে বহন করতে রাজি হয়নি এবং তা থেকে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ একে বহন করেছে, নিসন্দেহে সে বড় জালেম ও অজ্ঞ।[120] *এ আমানতের বোঝা উঠাবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদেরকে সাজা দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের তাওবা কবুল করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*

ভারতের শূদ্রদের চাইতেও খারাপ হতো। কিন্তু নিজেদের এ মহান হিতকারীর সাথে এ জাতির যে আচরণ ছিল তা অনুমান করার জন্য বাইবেলের নিম্নোক্ত স্থানগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যথেষ্ট হবে ঃ

যাত্রাপুস্তক ৫ ঃ ২০—২১, ১৪ ঃ ১১—১২, ১৬ ঃ ২—৩, ১৭ ঃ ৩—৪; গণনা পুস্তক ১১ ঃ ১—১৫, ১৪ ঃ ১—১০, ১৬ ঃ সম্পূর্ণ, ২০ ঃ ১—৫।

এত বড় হিতকারী ব্যক্তিত্বের সাথে বনী ইসরাঈল যে বৈরী নীতি অবলম্বন করেছিল। তার প্রতি ইংগিত করে কুরআন মজিদ মুসলমানদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ধরনের আচরণ করো না। অন্যথায় ইহুদিরা যে পরিণাম ভোগ করেছে ও করছে, তোমরা নিজেরাও সেই পরিণামের জন্য তৈরি হয়ে যাও।

একথাটিই বিভিন্ন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছেন। একবারের ঘটনা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে কিছু সম্পদ বিতরণ করছিলেন। এ মজলিস থেকে লোকেরা বাইরে বের হলে এক ব্যক্তি বললো, "মুহাম্মাদ এই বিতরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি একটুও নজর রাখেননি।" একথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) শুনতে পান। তিনি নবী করীমের কাছে গিয়ে বলেন, আজ আপনার সম্পর্কে এ ধরনের কথা তৈরি করা হয়। তিনি জবাবে বলেন ঃ

رحمة الله على موسى فانه اوذى باكثر من هذا فصبر

"মূসার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তাঁকে এর চেয়েও বেশী পীড়া ও যন্ত্রণা দেয়া হয় এবং তিনি সবর করেন।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

১২০. বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে আল্লাহ মানুষকে এ চেতনা দান করতে চান যে, দুনিয়ায় সে কোন্‌ ধরনের মর্যাদার অধিকারী এবং এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে যদি সে দুনিয়ার জীবনকে নিছক একটি খেলা মনে করে নিশ্চিন্তে ভুল নীতি অবলম্বন করে, তাহলে কিভাবে স্বহস্তে নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করে।

এ স্থানে "আমানত" অর্থ সেই "খিলাফতই", যা কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে মানুষকে দুনিয়ায় দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে আনুগত্য ও অবাধ্যতার যে স্বাধীনতা দান করেছেন এবং এ স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য তাকে অসংখ্য সৃষ্টির ওপর যে কর্তৃত্ব ক্ষমতা দিয়েছেন। তার অনিবার্য ফল স্বরূপ মানুষ নিজেই নিজের স্বেচ্ছাকৃত কাজের জন্য দায়ী গণ্য হবে এবং নিজের সঠিক কর্মধারার বিনিময়ে পুরস্কার এবং অন্যায় কাজের বিনিময়ে শাস্তির অধিকারী হবে। এসব ক্ষমতা যেহেতু মানুষ নিজেই অর্জন করেনি বরং আল্লাহ তাকে দিয়েছেন এবং এগুলোর সঠিক ও অন্যায় ব্যবহারের দরুন তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে, তাই কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এগুলোকে "খিলাফত" শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং এখানে এগুলোর জন্যই "আমানত" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এ আমানত কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বহ সে ধারণা দেবার জন্য আল্লাহ বলেন, আকাশ ও পৃথিবী তাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাহাড় তার বিশাল ও বিপুলায়তন দেহাবয়ব ও গম্ভীরতা সত্ত্বেও তা বহন করার শক্তি ও হিম্মত রাখতো না কিন্তু দুর্বল দেহাবয়বের অধিকারী মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতম প্রাণের ওপর এ ভারী বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে।

পৃথিবী ও আকাশের সামনে আমানতের বোঝা পেশ করা এবং তাদের তা উঠাতে অস্বীকার করা এবং ভীত হওয়ার ব্যাপারটি হতে পারে শাব্দিক অর্থেই সংঘটিত হয়েছে। আবার এও হতে পারে যে, একথাটি রূপকের ভাষায় বলা হয়েছে। নিজের সৃষ্টির সাথে আল্লাহর যে সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা জানতেও পারি না এবং বুঝতেও পারি না। পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য ও পাহাড় যেভাবে আমাদের কাছে বোবা, কালা ও প্রাণহীন, আল্লাহর কাছেও যে তারা ঠিক তেমনি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ নিজের প্রত্যেক সৃষ্টির সাথে কথা বলতে পারেন এবং সে তার জবাব দিতে পারে। এর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করার ক্ষমতা আমাদের বুদ্ধি ও বোধশক্তির নেই। তাই এটা পুরোপুরিই সম্ভব যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ নিজেই এ বিরাট বোঝা তাদের সামনে পেশ করে থাকবেন এবং তারা তা দেখে কেঁপে উঠে থাকবে আর তারা তাদের প্রভু ও স্রষ্টার কাছে এ নিবেদন পেশ করে থাকবে যে, আমরা তো আপনার ক্ষমতাহীন সেবক হয়ে থাকার মধ্যেই নিজেদের মংগল দেখতে পাই। নাফরমানী করার স্বাধীনতা নিয়ে তার হক আদায় করা এবং হক আদায় না করতে পারলে তার শাস্তি বরদাশত করার সাহস আমাদের নেই। অনুরূপভাবে এটাও সম্ভব, আমাদের বর্তমান জীবনের পূর্বে আল্লাহ সমগ্র মানব জাতিকে অন্য কোন ধরনের একটি অস্তিত্ব দান করে নিজের সামনে হাজির করে থাকবেন এবং তারা নিজেরাই এ দায়িত্ব বহন করার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকবে। একথাকে অসম্ভব গণ্য করার জন্য কোন যুক্তি আমাদের কাছে নেই। একে সম্ভাবনার গণ্ডীর বাইরে রাখার ফায়সালা সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে নিজের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে।

তবে এ বিষয়টাও সমান সম্ভবপর যে, নিছক রূপকের আকারে আল্লাহ এ বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন এবং অবস্থার অস্বাভাবিক গুরুত্বের ধারণা দেবার জন্য এমনভাবে তার নকশা পেশ করা হয়েছে যেন একদিকে পৃথিবী ও আকাশ এবং হিমালয়ের মতো গগণচুম্বী পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে আর অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে ৫/৬ ফুট লম্বা একজন মানুষ। আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন ঃ

"আমি আমার সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে কোন একজনকে এমন শক্তি দান করতে চাই যার ফলে আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে অবস্থান করে সে নিজেই স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আমার প্রাধান্যের স্বীকৃতি এবং আমার হুকুমের আনুগত্য করতে চাইলে করবে অন্যথায় সে আমাকে অস্বীকার করতেও পারবে আর আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা নিয়েও উঠতে পারবে। এ স্বাধীনতা দিয়ে আমি তার কাছ থেকে এমনভাবে আত্মগোপন করে থাকবো যেন আমি কোথাও নেই। এ স্বাধীনতাকে কার্যকর করার জন্য আমি তাকে ব্যাপক ক্ষমতা দান করবো, বিপুল যোগ্যতার অধিকারী করবো এবং নিজের অসংখ্য সৃষ্টির ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবো। এর ফলে বিশ্ব–জাহানে সে যা কিছু ভাঙা–গড়া করতে চায় করতে পারবে। এরপর একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমি তার কাজের হিসেব নেবো। যে আমার প্রদত্ত স্বাধীনতাকে ভুলপথে ব্যবহার করবে তাকে এমন শাস্তি দেবো যা কখনো আমার কোন সৃষ্টিকে আমি দেইনি। আর যে নাফরমানীর সমস্ত সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আমার আনুগত্যের পথই অবলম্বন করে থাকবে তাকে এমন উচ্চ মর্যাদা দান করবো যা আমার কোন সৃষ্টি লাভ করেনি। এখন বলো তোমাদের মধ্য থেকে কে এ পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছে?"

এ ভাষণ শুনে প্রথমে তো সমগ্র বিশ্ব–জগত নিরব নিথর দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একের পর এক এগিয়ে আসে। সকল প্রকাণ্ড অবয়ব ও শক্তির অধিকারী সৃষ্টি এবং তারা হাঁটু গেড়ে বসে কান্নাজড়িত স্বরে সানুনয় নিবেদন করে যেতে থাকে তাদেরকে যেন এ কঠিন পরীক্ষা থেকে মুক্ত রাখা হয়। সবশেষে এ একমুঠো মাটির তৈরি মানুষ ওঠে। সে বলে, হে আমার পওয়ারদিগার। আমি এ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। এ পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে তোমার সালতানাতের সবচেয়ে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবার যে আশা আছে সে কারণে আমি এ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যে যেসব আশংকা ও বিপদাপদ রয়েছে সেগুলো অতিক্রম করে যাবো।

নিজের কল্পনাদৃষ্টির সামনে এ চিত্র তুলে ধরেই মানুষ এই বিশ্ব–জাহানে কেমন নাজুক স্থানে অবস্থান করছে তা ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পারে। এখন এ পরীক্ষাগৃহে যে ব্যক্তি নিশ্চিন্তে বসে থাকে এবং কতবড় দায়িত্বের বোঝা যে সে মাথায় তুলে নিয়েছে, আর দুনিয়ার জীবনে নিজের জন্য কোন নীতি নির্বাচন করার সময় যে ফায়সালা সে করে তার সঠিক বা ভুল হবার ফল কি দাঁড়ায় তার কোন অনুভূতিই যার থাকে না তাকেই আল্লাহ এ আয়াতে জালেম ও অজ্ঞ বলে অভিহিত করছেন। সে অজ্ঞ, কারণ সেই বোকা নিজেই নিজেকে অদায়িত্বশীল মনে করে নিয়েছে। আবার সে জালেম, কারণ সে নিজেই নিজের ধ্বংসের ব্যবস্থা করছে এবং নাজানি নিজের সাথে সে আরো কতজনকে নিয়ে ডুবতে চায়।

পরিশিষ্ট

[৭৭ টীকার সাথে সংশ্লিষ্ট]

বর্তমান যুগে একটি দল নতুন নবুওয়াতের ফিত্‌না সৃষ্টি করেছে। এরা "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের অর্থ করে "নবীদের মোহর।" এরা বুঝাতে চায় রসূলুল্লাহর (সা) পর তাঁর মোহরাংকিত হয়ে আরো অনেক নবী দুনিয়ায় আগমন করবেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো নবুওয়াত রসূলুল্লাহর মোহরাংকিত না হয়, ততক্ষণ তিনি নবী হতে পারবেন না।

কিন্তু "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দ সম্বলিত আয়াতটি যে ঘটনা পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে, তাকে সেই বিশেষ পরিবেশে রেখে বিচার করলে, তা থেকে এ অর্থ গ্রহণের কোন সুযোগই দেখা যায় না। অধিকন্তু এ অর্থ গ্রহণ করার পর এ পরিবেশে শব্দটির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।[১] এটা কি নিতান্ত অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় যে, যয়নবের নিকাহর বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট নানাপ্রকার সংশয়–সন্দেহের জবাব দিতে দিতে হঠাৎ মাঝখানে বলে দেয়া হলো ঃ মুহাম্মাদ (সা) নবীদের মোহর। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যত নবী আসবেন তাঁরা সবাই তাঁরই মোহরাংকিত হবেন। আগে পিছের এ ঘটনার মাঝখানে একথাটির আকস্মিক আগমন শুধু অবান্তরই নয়, এ থেকে প্রতিবাদকারীদের জবাবে যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছিল, তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিবাদকারীদের হাতে একটা চমৎকার সুযোগ আসতো এবং তারা সহজেই বলতে পারতো যে, আপনার জীবনে যদি এ কাজটা সম্পন্ন না করতেন, তাহলে ভালই হতো, কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকতো না, এই বদ রসমটা বিলুপ্ত করার যদি এতোই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে আপনার পরে আপনার মোহরাংকিত হয়ে যেসব নবী আসবেন, এ কাজটা তাঁদের হাতেই সম্পন্ন হবে।

উল্লেখিত দলটি শব্দটির আর একটি বিকৃত অর্থ নিয়েছে ঃ "খাতামুন নাবিয়্যীন" অর্থ হলো ঃ "আফজালুন নাবিয়্যীন।'' অর্থাৎ নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা নবুওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে রসূলুল্লাহর ওপর। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখিত বিভ্রান্তির পুনরাবির্ভাবের হাত থেকে নিস্তার নেই। অগ্রপশ্চাতের সাথে এরও কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটি পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবহ। কাফের ও মুনাফিকরা বলতে পারতো ঃ "জনাব, আপনার চাইতে কম মর্যাদার হলেও আপনার পরে যখন আরো নবী আসছেন, তখন এ কাজটা না হয় তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন। এ বদ রসমটাও যে আপনাকেই মিটাতে হবে, এরই বা কি এমন আবশ্যকতা আছে!"

১. বর্ণনার ধারাবাহিকতা অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ৬৭ থেকে ৭৯ টীকার আলোচনাও সামনে রাখা দরকার।

আভিধানিক অর্থ

তাহলে পূর্বাপর ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে একথা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এখানে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ নবুওয়াতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (সা) পর আর কোন নবী আসবেন না। কিন্তু শুধু পূর্বাপর সম্বন্ধের দিক দিয়েই নয়, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়েও এটিই একমাত্র সত্য। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খতম'; শব্দের অর্থ হলো ঃ মোহর লাগানো, বন্ধ করা, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং কোন কাজ শেষ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করা।

খাতামাল আমাল (خَتَمَ الْعَمَلَ) অর্থ হলো ঃ ফারাগা মিনাল আমাল (فَرَغَ مِنَ الْعَمَلِ) অর্থাৎ কাজ শেষ করে ফেলেছে।

খাতামাল এনায়া (خَتَمَ الاناء) অর্থ হলো ঃ পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে আসতে এবং বাইরে থেকে কিছু ভেতরে যেতে না পারে।

খাতামাল কিতাব (خَتَمَ الْكِتَابَ) অর্থ হলো ঃ পত্র বন্ধ করে তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, ফলে পত্রটি সংরক্ষিত হবে।

খাতামা আলাল কাল্‌ব (خَتَمَ عَلَى الْقَلْبِ) অর্থ হলো ঃ দিলের ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। এরপর কোন কথা আর সে বুঝতে পারবে না এবং তার ভেতরের জমে থাকা কোন কথা বাইরে বেরুতে পারবে না।

খিতামু কুল্লি মাশরুব (خِتَامُ كُلِّ مَشْرُوبٍ) অর্থ হলো ঃ কোন পানীয় পান করার পর শেষে যে স্বাদ অনুভূত হয়।

খাতিমাতু কুল্লি শাইয়িন আকিবাতুহু ওয়া আখিরাতুহু (خَاتِمَةُ كُلِّ شَيْءٍ عَاقِبَتُهُ وَاخِرَتُهُ) অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের খাতিমা অর্থ হলো তার পরিণাম এবং শেষ।

খাতামাশ্ শাইয়্যি বালাগা আখিরাহ (خَتَمَ الشَّيْءَ ، بَلَغَ اخِرَهُ) অর্থাৎ কোন জিনিসকে খতম করার অর্থ হলো তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। খত্‌মে কুরআন বলতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং এ অর্থের ভিত্তিতে প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় 'খাওয়াতিম'।

খাতামুল কওমে আখেরুহুম (خَاتَمُ الْقَوْمِ اخِرُهُمْ) অর্থাৎ খাতামুল কওম অর্থ জাতির শেষ ব্যক্তি (দ্রষ্টব্য ঃ লিসানুল আরব, কামুস এবং আকরাবুল মাওয়ারিদ।)[১]

এ জন্যই সমস্ত অভিধান বিশারদ এবং তাফসীরকারগণ একযোগে "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের অর্থ নিয়েছেন, আখেরুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খাতাম'–এর অর্থ ডাকঘরের মোহর নয়, যা চিঠির ওপর লাগিয়ে চিঠি পোষ্ট করা হয়; বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এ উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে বেরুতে পারবে না এবং বাইরের কোন জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

১. এখানে আমি মাত্র তিনটি অভিধানের উল্লেখ করলাম। কিন্তু শুধু এই তিনটি অভিধানই কেন, আরবী ভাষায় যে কোন নির্ভরযোগ্য অভিধান খুলে দেখুন, সেখানে 'খতম' শব্দের উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যাই

খত্‌মে নবুওয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি

পূর্বাপর সম্বন্ধ এবং আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে শব্দটির যে অর্থ হয়, রসূলুল্লাহর (সা) বিভিন্ন ব্যাখ্যাও তা সমর্থন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কতিপয় অত্যন্ত নির্ভুল হাদীসের উল্লেখ করছি ঃ

(١) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الاَنْبِيَاءُ - كُلَّمَا هَلَكَ نَبِي خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَاِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءَ - (بخارى ، كتاب المناقب ، باب ماذكر عن بنئ اسرائيل)

পাবেন। কিন্তু 'খত্‌মে নবুওয়াত' অস্বীকারকারীরা আল্লাহর দীনের সুরক্ষিত গৃহে সিঁদ কাটার জন্য এর আভিধানিক অর্থকে পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন। তারা বলতে চান, কোন ব্যক্তিকে 'খাতামুশ শো'য়ারা', 'খাতামুল ফোকাহা' অথবা 'খাতামুল মুফাস্‌সিরীন' বললে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় না যে, যাকে ঐ পদবী দেয়া হয়, তার পরে আর কোন শায়ের তথা কবি, ফকিহ্ অথবা মুফাস্‌সির পয়দা হননি। বরং এর অর্থ এই হয় যে, ঐ ব্যক্তির ওপরে উল্লিখিত বিদ্যা অথবা শিল্পের পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যধিক ফুটিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে এই ধরনের পদবী ব্যবহারের ফলে কখনো খতম–এর আভিধানিক অর্থ 'পূর্ণ' অথবা 'শ্রেষ্ঠ' হয় না এবং 'শেষ' অর্থে এর ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ বলেও গণ্য হয় না। একমাত্র ব্যাকরণ–রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এ ধরনের কথা বলতে পারেন। কোন ভাষারই নিয়ম এ নয় যে, কোন একটি শব্দ তার আসল অর্থের পরিবর্তে কখনো কখনো দূর সম্পর্কের অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হলে সেটাই তার আসল অর্থে পরিণত হবে এবং আসল আভিধানিক অর্থে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। আপনি যখন কোন আরবের সম্মুখে বলবেন ঃ جَاءَ خَاتَمُ الْقَوْمُ (জাআ খাতামুল কওম)—তখন কখনো সে মনে করবে না যে, গোত্রের শ্রেষ্ঠ অথবা কামেল ব্যক্তি এসেছে। বরং সে মনে করবে যে, গোত্রের সবাই এসে গেছে, এমনকি অবশিষ্ট শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্তও।

এই সংগে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, কোন কোন লোককে যে "খাতামুশ শো'য়ারা" "খাতামুল ফুকাহা" ও "খাতামুল মুহাদ্দিসীন" উপাধিগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো মানুষরাই তাদেরকে দিয়েছে। আর মানুষ যে ব্যক্তিকে কোন গুণের ক্ষেত্রে "শেষ" বলে দিচ্ছে তার পরে ঐ গুণ সম্পন্ন আর কেউ জন্মাবে কিনা তা সে কখনোই জানতে পারে না। তাই মানুষের কথায় এ ধরনের উপাধির অর্থ নিছক বাড়িয়ে বলা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার স্বীকৃতি ছাড়া আর বেশী কিছু হতে পরে না। কিন্তু আল্লাহ যখন কারো ব্যাপারে বলে দেন যে, অমুক গুণটি অমুক ব্যক্তি পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে তখন তাকে মানুষের কথার মতো উপমা বা রূপক মনে করে নেবার কোন কারণ নেই। আল্লাহ যদি কাউকে শেষ কবি বলে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিন্তভাবে তারপর আর কোন কবি হতে পারে না। আর তিনি যাকে শেষ নবী বলে দিয়েছেন তাঁর পরে আর কোন নবী হওয়াই অসম্ভব। কারণ, আল্লাহ হচ্ছেন 'আলিমুল গাইব' এবং মানুষ আলিমুল গাইব নয়। আল্লাহর কাউকে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' বলে দেয়া এবং মানুষের কাউকে 'খাতামুশ শোয়ারা বা খাতামুল ফুকারা', বলে দেয়া কেমন করে একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে?

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বনী ইস্রাঈলের নেতৃত্ব করতেন আল্লাহর রসূলগণ। যখন কোন নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য কোন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্তি হতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী হবে না, শুধু খলীফা।

(٢) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَثَلِى وَمَثَلُ الاَنبِيَاءِ مِن قَبلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيتًا فَاَحسَنَهُ وَاَجمَلَهُ اِلاَّ مَوضَعِ لِبنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُوْنَ بِهٖ وَيَعْجِبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ فَانَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ - (بخارى كتاب المناقب - باب خاتم النبين)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরি করলো এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করলো। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইঁটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, "এ স্থানে একটা ইঁট রাখা হয়নি কেন? বস্তুত আমি সেই ইঁট এবং আমিই শেষ নবী।" (অর্থাৎ আমার আসার পর নবুওয়াতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন এর মধ্যে এমন কোন শূন্যস্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য আবার কোন নবীর প্রয়োজন হবে।)

এই বক্তব্য সম্বলিত চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে কিতাবুল ফাযায়েলের বাবু খাতামুন নাবিয়্যানে উল্লেখিত হয়েছে। এবং শেষ হাদীসটিতে এতোটুকু অংশ বর্ধিত হয়েছে ঃ فَجِئْتُ فَخَتَمْتُ الاَنبِيَاءَ "অতপর আমি এলাম এবং আমি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিলাম।"

হাদীসটি তিরমিযী শরীফে একই শব্দ সম্বলিত হয়ে 'কিতাবুল মানাকিবের বাবু ফাদ্‌লিন নাবী' এবং কিতাবুল আদাবের 'বাবুল আমসালে' বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আবু দাউদ তিয়ালাসীতে হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের সিলসিলায় উল্লেখিত হয়েছে এবং এর শেষ অংশটুকু হলো خُتِمَ بِى الاَنبِيَاءُ "আমার মাধ্যমে নবীদের সিলসিলা খতম করা হলো।"

মুসনাদে আহমাদে সামান্য শাব্দিক হেরফেরের সাথে এই বক্তব্য সম্বলিত হাদীস হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।

(٣) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الاَنبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ و اُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ ،

وَجُعِلَتْ لِىَ الاَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا ، وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَّخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ - (مسلم - ترمذى - ابن ماجه)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "ছ'টা ব্যাপারে অন্যান্য নবীদের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে ঃ (১) আমাকে পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। (২) আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) যুদ্ধলব্ধ অর্থ–সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (৪) পৃথিবীর যমীনকে আমার জন্য মসজিদে (অর্থাৎ আমার শরীয়াতে নামায কেবল বিশেষ ইবাদাতগাহে নয়, দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানে পড়া যেতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে (শুধু পানিই নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল অর্থাৎ অজু এবং গোসলের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে) পরিণত করা হয়েছে। (৫) সমগ্র দুনিয়ার জন্য আমাকে রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং (৬) আমার ওপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে।"

(٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَ النُّبُوَّةَ قَدْ انقَطَعَتْ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِى وَلاَ نَبِىَّ - (ترمذى - كتاب الرؤيا ، باب ذهاب النبوة - مسند احمد ، مرويات انس بن مالك رض)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "রিসালাত এবং নবুওয়াতের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। আমার পর আর কোন রসূল এবং নবী আসবে না।"

(٥) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا مُحَمَّد ، وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِى الَّذِى يُمْحَى بِىَ الْكُفْرُ ، وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحشِرُ النَّاسَ عَلَى عَقبِى ، وَاَنَا الْعَاقِبُ الَّذِى لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ - (بخارى و مسلم ، كتاب الفضائل - باب اسماء النبى- ترمذى ، كتاب الاداب ، باب اسماء النبى- مؤطاء - كتاب اسماء النبى - المستدرك للحاكم ، كتاب التاريخ ، باب اسماء النبى)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "আমি মুহাম্মাদ। আমি আহমাদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদেরকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকি আছে) আমি সবার শেষে আগমনকারী (এবং সবার শেষে আগমনকারী হলো সেই) যার পরে আর নবী আসবে না।"

(٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا اِلاَّ حَذَّرَ

أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ وَأَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ اٰخِرُ الْاُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيْكُمْ لَا مَحَالَةَ – (ابن ماجه – كتاب الفتن ، باب الدجال)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। (কিন্তু তাদের যুগে সে বহির্গত হয়নি) এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মাত। দাজ্জাল নিসন্দেহে এখন তোমাদের মধ্যে বহির্গত হবে।"

(৭) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وبْنِ العاصِ يَقُوْلُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَالْمُوَدِّعِ فَقَالَ اَنَا مُحَمَّدُ النَّبِيُّ الْاُمِّى ثَلَاثًا وَلَا نَبِيَّ بَعْدِى – (مسند احمد– مرويات – عبد اللّٰه بن عمروبن العاص)

আবদুর রহমান ইবনে জোবায়ের বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আ'সকে বলতে শুনেছি, একদিন রসূলুল্লাহ (সা) নিজের গৃহ থেকে বরে হয়ে আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনলেন। তিনি এভাবে আসলেন যেন আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মুহাম্মাদ। অতপর বললেন, আমার পর আর কোন নবী নেই।

(৮) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِى اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ قِيْلَ وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ – اَو قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ – (مسند احمد ، مرويات ابو الطفيل – نسائى ابو داؤد)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার পরে আর কোন নবুওয়াত নেই। আছে সুসংবাদ দানকারী ঘটনাবলী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল, সুসংবাদ দানকারী ঘটনাগুলো কি? জবাবে তিনি বললেন ঃ ভালো স্বপ্ন। অথবা বললেন, কল্যাণময় স্বপ্ন। (অর্থাৎ আল্লাহর অহী নাযিল হবার এখন আর সম্ভাবনা নেই। বড় জোর এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যদি কাউকে কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়, তাহলে শুধু ভালো স্বপ্নের মাধ্যমেই তা দেয়া হবে)।

(৯) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ – (ترمذى – كتاب المناقب)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার পরে যদি কোন নবী হতো, তাহলে উমর ইবনে খাত্তাব সে সৌভাগ্য লাভ করতো।

(١٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ اَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلاَّ اَنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى - (بخارى ومسلم - كتاب فضائل الصحابه)

রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে (রা) বলেন ঃ আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই।

বুখারী এবং মুসলিম তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসংগেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত দু'টি হাদীস হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বর্ণনার শেষাংশ হলো ঃ الا انه لانبوة بعدى "কিন্তু আমার পরে আর কোন নবুওয়াত নেই।" আবু দাউদ তিয়ালাসি, ইমাম আহমাদ এবং মুহাম্মাদ ইসহাক এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে (রা) মদীনা তাইয়্যেবার তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে যাবার ফায়সালা করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুনাফিকরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে থাকে। হযরত আলী (রা) রসূলুল্লাহকে (সা) বলেন, "হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি আমাকে শিশু এবং নারীদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন?" রসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন ঃ "আমার সাথে তোমার সম্পর্কতো মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। "অর্থাৎ তূর পর্বতে যাবার সময় হযরত মূসা (আ) যেমন বনী ইসরাঈলদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হযরত হারুনকে পেছনে রেখে গিয়েছিলেন অনুরূপভাবে মদীনার হেফাজতের জন্য আমি তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সংগে সংগে রসূলুল্লাহর মনে এই সন্দেহও জাগে যে, হযরত হারুনের সংগে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়তো পরে এ থেকে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই পরমুহূর্তেই তিনি কথাটা স্পষ্ট করে দেন এই বলে যে, "আমার পর আর কোন ব্যক্তি নবী হবে না।"

(١١) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... وَاَنَّهُ سَيَكُوْنُ فِى اُمَّتِى ثَلاَثُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى (ابو داود - كتاب الفتن)

হযরত সাওবান বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আর কথা হচ্ছে এই যে, আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমার পর আর কোন নবী নেই।

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আর একটি হাদীস আবু দাউদ 'কিতাবুল মালাহেমে' হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও হযরত সাওবান এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে এ হাদীস দু'টি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটির শব্দ হলো এই ঃ

حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ للّٰه –

অর্থাৎ এমন কি তিরিশ জনের মতো প্রতারক আসবে। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রসূল।

(١٢) قال النبى صلى اللّٰه عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن من امتى احد فعمر – (بخارى ، كتاب المناقب)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে অনেক লোক এমন ছিলেন, যাঁদের সংগে কথা বলা হয়েছে, অথচ তাঁরা নবী ছিলেন না। আমার উম্মাতের মধ্যে যদি এমন কেউ হয়, তাহলে সে হবে উমর।

মুসলিমে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত যে হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, তাতে يكلمون–এর পরিবর্তে محدثون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মুকাল্লাম এবং মুহাদ্দাস শব্দ দু'টি সমার্থক। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার সংগে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন অথবা যার সাথে পর্দার পেছন থেকে কথা বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, নবুওয়াত ছাড়াও যদি এই উম্মাতের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করতো তাহলে তিনি একমাত্র হযরত উমরই হতেন।

(١٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى وَلاَ اُمَّةَ بَعْدَ اُمَّتِى (بيهقى ، كتاب الرؤيا – طبرانى)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার পরে আর কোন নবী নেই এবং আমার উম্মাতের পর আর কোন উম্মাত (অর্থাৎ কোন ভবিষ্যত নবীর উম্মাত) নেই।

(١٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنِّى اٰخِرُ الاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ مَسْجِدِى اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ – (مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل الصلواة بمسجد مكة والمدينة)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি শেষ নবী এবং আমার মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী) শেষ মসজিদ।[১]

রসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে বহু সাহাবী হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সনদসহ এগুলো উদ্ধৃত করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার করে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী। তাঁর পর কোন নবী আসবে না। নবুওয়াতের সিলসিলা তাঁর ওপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পরে যে ব্যক্তি রসূল অথবা নবী হবার দাবী করবে, সে হবে দাজ্জাল (প্রতারক) এবং কাজ্জাব ও মিথ্যুক।[২] কুরআনের "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের এর চাইতে বেশী শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে! রসূলুল্লাহর বাণীই এখানে চরম সনদ এবং প্রমাণ। উপরন্তু যখন তা কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে তখন আরো অধিক শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, মুহাম্মাদের (সা) চেয়ে বেশী কে কুরআনকে বুঝেছে এবং তাঁর চাইতে বেশী এর ব্যাখ্যার অধিকার কার আছে? এমন কে আছে যে, খতমে নবুওয়াতের অন্য কোন অর্থ বর্ণনা করবে এবং তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেও আমরা প্রস্তুত হবো?

---

১. খত্‌মে নবুওয়াত অস্বীকারীরা এ হাদীস থেকে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ (সা) যেমন তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ বলেছেন, অথচ এটি শেষ মসজিদ নয়; এরপরও দুনিয়ায় বেশুমার মসজিদ নির্মিত হয়েছে অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন যে, তিনি শেষ নবী। এর অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরেও নবী আসবেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তিনি হলেন শেষ নবী এবং তাঁর মসজিদ শেষ মসজিদ। কিন্তু আসলে এ ধরনের বিকৃত অর্থই একথা প্রমাণ করে যে, এ লোকগুলো আল্লাহ এবং রসূলের কালামের অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম শরীফের যে স্থানে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে এ বিষয়ের সমস্ত হাদীস সম্মুখে রাখলেই একথা পরিস্ফুট হবে যে, রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ কোন্ অর্থে বলেছেন। এখানে হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং হযরত মায়মুনার (রা) যে বর্ণনা ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় মাত্র তিনটি মসজিদ এমন রয়েছে যেগুলো সাধারণ মসজিদগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। সেখানে নামায পড়লে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী সওয়াব হাসিল হয় এবং এ জন্য একমাত্র এ তিনটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করা জায়েয। দুনিয়ার অবশিষ্ট মসজিদগুলোর মধ্যে সমস্ত মসজিদকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে একটি মসজিদে নামায পড়বার জন্য সেদিকে সফর করা জায়েয নয়। এর মধ্যে 'মসজিদুল হারাম' হলো প্রথম মসজিদ। হযরত ইবরাহীম (আ) এটি বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো 'মসজিদে আক্‌সা' হযরত সুলাইমান (আ) এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং তৃতীয়টি মদীনা তাইয়েবার 'মসজিদে নববী'। এটি নির্মাণ করেন রসূলুল্লাহ (সা)। রসূলুল্লাহর (সা) এরশাদের অর্থ হলো এই যে, এখন যেহেতু আমার পর আর কোন নবী আসবে না, সেহেতু আমার মসজিদের পর দুনিয়ায় আর চতুর্থ এমন কোন মসজিদ নির্মিত হবে না, যেখানে নামায পড়ার সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বেশী হবে এবং সেখানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সেদিকে সফর করা জায়েয হবে।

২. শেষ নবুওয়াতে অবিশ্বাসীরা নবী করিমের (সা) হাদীসের বিপরীতে হযরত আয়েশার (রা) বলে কথিত নিম্নোক্ত বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয় ঃ "বল নিশ্চয়ই তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন, একথা বলো না যে তার পর নবী নেই।" প্রথমত নবী করিমের (সা) সুস্পষ্ট আদেশকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার (রা)

সাহাবীদের ইজমা

কুরআন এবং সুন্নাহর পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা মতৈক্য হলো তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহর (সা) ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যেসব লোক নবুওয়াতের দাবী করে এবং যারা তাদের নবুওয়াত স্বীকার করে নেয়, তাদের সবার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মুসাইলামা কাজ্জাবের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। সে রসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত অস্বীকার করছিল না; বরং সে দাবী করেছিল যে, রসূলুল্লাহর নবুওয়াতে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পূর্বে সে তাঁর নিকট যে চিঠি পাঠিয়েছিল তার আসল শব্দ হলো এই ঃ

مِنْ مُسَيْلَمَةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلٰى مُحَمَّدٍ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّى اُشْرِكْتُ فِى الْاَمْرِ مَعَكَ (طبرى ، جلد ٢ ، صفحه ٣٩٩ ، طبع مصر)

"আল্লাহ্‌র রসূল মুসাইলামার তরফ হতে আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মাদের নিকট। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুওয়াতের কাজে শরীক করা হয়েছে।"

এ ছাড়াও ঐতিহাসিক তাবারী একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মুসাইলামার ওখানে যে আযান দেয়া হতো তাতে اشهد ان محمدا رسول اللّٰه শব্দাবলীও বলা হতো। এভাবে স্পষ্ট করে রিসালাতে মুহাম্মাদীকে স্বীকার করে নেবার পরও তাকে কাফের ও ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, বনু হোনায়ফা সরল অন্তকরণে তার ওপর ঈমান এনেছিল। অবশ্য তারা এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সা) নিজেই তাকে তাঁর নবুওয়াতের কাজে শরীক করেছেন। এ ছাড়াও আর একটা কথা হলো এই যে, মদীনা তাইয়্যেবা থেকে এক ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং বনু হোনায়ফার নিকটে গিয়ে সে কুরআনের আয়াতকে মুসাইলামার নিকট অবতীর্ণ আয়াতরূপে পেশ করেছিল। (البداية والنهاية لابن كثير - جلدة صفحه ١٠) কিন্তু এ সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুসলমান বলে স্বীকার করেননি এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অতপর একথা বলার সুযোগ নেই যে, ইসলাম বহির্ভূত হবার কারণে সাহাবীগণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

উদ্ধৃতি দেয়া একটা ধৃষ্টতা। অধিকন্তু হযরত আয়েশার (রা) বলে কথিত উপরোক্ত উদ্ধৃতি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীস শাস্ত্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই হযরত আয়েশার (রা) উপরোক্ত উক্তির উল্লেখ নেই। কোন বিখ্যাত হাদীস লিপিবদ্ধকারী এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ বা উল্লেখ করেননি। উপরোক্ত হাদীসটি 'দুররি মানসূর' নামক তাফসীর এবং 'তাকমিলাহ মাজমা–উল–বিহার' নামক অপরিচিত হাদীস সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে; কিন্তু এর উৎপত্তি বা বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। রসূল (সা)–এর সুস্পষ্ট হাদীস যা বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারীরা খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার (রা) উক্তির, যা দুর্বলতম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ চূড়ান্ত ধৃষ্টতা মাত্র।

হয়েছিল। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলেও তাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলামে পরিণত করা যেতে পারে না। বরং শুধু মুসলমানই নয় জিম্মীও (অমুসলিম) বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, গ্রেফতার করার পর তাকে গোলামে পরিণত করা জায়েয নয়। কিন্তু মুসাইলামা এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ঘোষণা করেন যে, তাদের মেয়েদের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে গোলাম বানানো হবে এবং গ্রেফতার করার পর দেখা গেলো, সত্যি সত্যিই তাদেরকে গোলাম বানানো হয়েছে। হযরত আলী (রা) তাদের মধ্য থেকেই জনৈক যুদ্ধ বন্দিনীর মালিক হন। এই যুদ্ধ বন্দিনীর গর্ভজাত পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াই[১] হলেন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। (البداية والنهاية جلد ٢ – ٣١٦ – ٣٢. صفحه) এ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোন বিদ্রোহের অপরাধ ছিল না বরং সে অপরাধ ছিল এই যে, এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুওয়াতের দাবী করে এবং অন্য লোকেরা তার নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনে। রসূলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর নেতৃত্ব দেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রা) এবং সাহাবীদের সমগ্র দলটি একযোগে তাঁর নেতৃত্বাধীনে এ কাজে অগ্রসর হন। সাহাবীদের ইজমার এর চাইতে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে।

উম্মাতের সমগ্র আলেম সমাজের ইজমা

শরীয়াতে সাহাবীদের ইজমার পর চতুর্থ পর্যায়ের সবচাইতে শক্তিশালী দলিল হলো সাহাবীগণের পরবর্তী কালের আলেম সমাজের ইজমা। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকার আলেম সমাজ হামেশাই এ ব্যাপারে একমত রয়েছেন যে, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে কোন ব্যক্তি নবী হতে পারে না। এবং তাঁর পর যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করবে এবং যে ব্যক্তি এই মিথ্যা দাবীকে মেনে নেবে, সে কাফের এবং মিল্লাতে ইসলামের মধ্যে তার স্থান নেই।"

এ ব্যাপারে আমি কতিপয় প্রমাণ পেশ করছি ঃ

(১) ইমাম আবু হানীফার যুগে (৮০—১৫০ হি) এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করে এবং বলে ঃ "আমাকে সুযোগ দাও, আমি নবুওয়াতের সংকেত চিহ্ন পেশ করব।"

একথা শুনে ইমাম সাহেব বলেন ঃ যে ব্যক্তি এর কাছ থেকে নবুওয়াতের কোন সংকেত, চিহ্ন তলব করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ "আমার পর আর কোন নবী নেই।"

১. হানাফিয়া নামে বনু হানাফিয়্যা গোত্রের মহিলা।

(২) আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (২২৪—৩১০ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত কুরআনের তাফসীরে (ولكن رسول الله وخاتم النبين) আয়াতটির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

اَلَّذِىْ خَتَمَ النُّبُوَّةَ فَطُبِعَ عَلَيْهَا فَلاَ تُفْتَحُ لاَحَدٍ بَعْدَهُ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ-

"যে নবুওয়াতকে খতম করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত এর দরজা আর কারো জন্য খুলবে না।" (তাফসীরে ইবনে জারীর, ২২ খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা)

(৩) ইমাম তাহাবী (হিঃ ২৩৯—৩২১) তাঁর 'আকীদাতুস সালাফীয়া' গ্রন্থে সালাফে সালেহীন (প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ সৎকর্মশীলগণ) এবং বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহেমাহুমুল্লাহর আকিদা বিশ্বাস বর্ণনা প্রসংগে নবুওয়াত সম্পর্কিত এ বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করেছেন যে, "আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, নির্বাচিত নবী ও পছন্দনীয় রসূল এবং শেষ নবী, মুত্তাকীদের ইমাম, রসূলদের সরদার ও রব্বুল আলামীনের বন্ধু। আর তাঁর পর নবুওয়াতের প্রত্যেকটি দাবী পথভ্রষ্টতা এবং প্রবৃত্তির লালসার বন্দেগী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (শারহুত তাহাবীয়া ফিল আকীদাতিস সালাফিয়া, দারুল মা'আরিফ মিসর, ১৫, ৮৭, ৯৬, ৯৭, ১০০ ও ১০২ পৃষ্ঠা)

(৪) আল্লামা ইবনে হাজাম আন্দালুস (৩৮৪—৪৫৬ হিঃ) লিখেছেন ঃ নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর অহীর সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। এর সপক্ষে যুক্তি এই যে, অহী আসে একমাত্র নবীর কাছে এবং মহান আল্লাহ বলেছেন, "মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়। কিন্তু সে আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী" (আল মুহাল্লা, প্রথম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

(৫) ইমাম গায্‌যালী বলেন ঃ (৪৫০—৫০৫ হিঃ)[১]

لو فتح هذا الباب (اى باب انكار كون الاجماع حجة) انجو الى امور شنيعة وهو ان قائلا لو قال يجوز ان يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيبعد التوقف فى تكفيره ، ومستبعد استحالة ذالك عند البحث تستمد من الاجماع لا محالة ، فان العقل لا يحيله ، وما نقل فيه من قوله لا نبى بعدى ، ومن قوله تعالى خاتم النبيين ، فلا يعجز هذا القائل عن تاويله ، فيقول

১. ইমাম গাজ্জালীর এ অভিমতটি এর মূল ইবারত সহকারে এখানে উদ্ধৃত করছি এ জন্য যে, খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীরা এ বরাতের নির্ভুলতাকে জোরে শোরে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

خاتم النبيين اراد به اولوا العزم من الرسل ، فان قالوا النبيين عام ، فلا يبعد تخصيص العام ، وقوله لا نبى بعدى لم يردبه الرسول وفرق بين النبى والرسول والنبى اعلى مرتبة من الرسول الى غير ذالك من انواع الهذيان ، فهذا وامثاله لا يمكن ان ندعى استحالته ، من حيث مجرد اللفظ ، فانا فى تاويل ظواهر التشبيه فضينا باحتمالات ابعد من هذه ، ولم يكن ذالك مبطلا للنصوص ، ولكن الرد على هذا القائل ان الامة فهمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افهم عدم نبى بعده ، ابدا وعدم رسول الله ابدا وانه ليس فيه تاويل ولا تخصيص فمنكر هذا لايكون الا منكر الاجماع (الاقتصاد فى الاعتقاد المطبعة الادبيه ، مصر ، ص ١١٤)

"যদি এ দরোজাটি (অর্থাৎ ইজমাকে প্রমাণ হিসেবে মানতে অস্বীকার করার দরোজা) খুলে দেয়া হয় তাহলে বড়ই ন্যক্কারজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যেমন যদি কেউ বলে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে অন্য কোন নবীর আগমন অসম্ভব নয়, তাহলে তাকে কাফের বলার ব্যাপারে ইতস্তত করা যেতে পারে না। কিন্তু বিতর্কের সময় যে ব্যক্তি তাকে কাফের আখ্যায়িত করতে ইতস্তত করাকে অবৈধ প্রমাণ করতে চাইবে তাকে অবশ্যই ইজমার সাহায্য নিতে হবে। কারণ নিরেট যুক্তি দ্বারা তার অবৈধ হবার ফায়সালা করা যায় না। আর কুরআন ও হাদীসের বাণীর ব্যাপারে বলা যায়, এ মতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি "আমার পরে আর কোন নবী নেই" এবং "নবীদের মোহর" এ উক্তি দু'টির নানা রকম চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হবে না। সে বলবে, "খাতামুন নাবীয়্যীন" মানে হচ্ছে অতীব মর্যাদাবান নবীদের আগমন শেষ হয়ে যাওয়া। আর যদি বলা হয়, "নবীগণ" শব্দটি দ্বারা সাধারণভাবে সকল নবীকে বুঝানো হয়েছে, তাহলে এই 'সাধারণ' থেকে 'অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী' বের করা তার জন্য মোটেই কঠিন হবে না। "আমার পর আর নবী নেই" .এ ব্যাপারে সে বলে দেবে, "আমার পর আর রসূল নেই" একথা তো বলা হয়নি। রসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য আছে। নবীর মর্যাদা রসূলের চেয়ে বেশী। মোটকথা এ ধরনের আজেবাজে উদ্ভট কথা অনেক বলা যেতে পারে। আর নিছক শাব্দিক দিক দিয়ে এ ধরনের চুলচেরা ব্যাখ্যাকে আমরা একেবারে অসম্ভবও বলি না। বরং বাহ্যিক উপমার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা এর চেয়েও দূরবর্তী সম্ভাবনার অবকাশ স্বীকার করি। আর এ ধরনের

ব্যাখ্যাকারীদের সম্পর্কে আমরা একথাও বলতে পারি না যে, কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য সে অস্বীকার করছে। কিন্তু এ অভিমতের প্রবক্তার বক্তব্য খণ্ডন করে আমি বলবো, মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ শব্দ(অর্থাৎ আমার পরে আর কোন নবী নেই) থেকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনাবলীর প্রমাণাদি থেকে একথাই বুঝেছে যে, নবী করীমের (সা) উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, তাঁর পরে আর কখনো কোন নবী আসবে না এবং রসূলও আসবে না। এ ছাড়া মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারেও একমত যে, এর মধ্যে কোন তাবীল, ব্যাখ্যা ও বিশেষিত করারও কোন অবকাশ নেই। কাজেই এহেন ব্যক্তিকে ইজমা অস্বীকারকারী ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

(৬) মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী (মৃত্যু ঃ ৫১০ হিঃ) তাঁর তাফসীরে মা'আলিমুত তানজীল–এ লিখেছেন ঃ রসূলুল্লাহর (সা) মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াতের সিলসিলা খতম করেছেন। কাজেই তিনি সর্বশেষ নবী এবং ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদের (সা) পর কোন নবী নেই। (তৃতীয় খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

(৭) আল্লামা যামাখশারী (৪৬৭—৫৩৮ হিঃ) তাফসীরে কাশশাফে লিখেছেন ঃ যদি তোমরা বল, রসূলুল্লাহ (সা) শেষ নবী কেমন করে হলেন, কেননা হযরত ঈসা (আ) শেষ যুগে অবতীর্ণ হবেন, তাহলে আমি বলবো, রসূলুল্লাহর শেষ নবী হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরে আর কাউকে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হবে না। হযরত ঈসাকে (আ) রসূলুল্লাহর (সা) পূর্বে নবী বানানো হয়েছে। অবতীর্ণ হবার পর তিনি রসূলুল্লাহর অনুসারী হবেন এবং তাঁর কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহ্‌র (সা) উম্মাতের মধ্যে শামিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)

(৮) কাজী ইয়ায (মৃত্যু ঃ ৫৪৪ হিঃ) লিখেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে নবুওয়াতের দাবী করে অথবা একথাকে বৈধ মনে করে যে, যে কোন ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় নবুওয়াত হাসিল করতে পারে এবং অন্তত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নবীর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে (যেমন কোন কোন দার্শনিক এবং বিকৃতমনা সূফী মনে করেন) এবং এভাবে যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করে না অথচ একথার দাবী জানায় যে, তার ওপর অহী নাযিল হয়,—এ ধরনের সমস্ত লোক কাফের এবং তারা রসূলুল্লাহর নবুওয়াতকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করছে। কেননা তিনি খবর দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী এবং তাঁর পর কোন নবী আসবে না এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এ খবর পৌঁছিয়েছেন যে, তিনি নবুওয়াতকে খতম করে দিয়েছেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে। সমগ্র মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কথাটির বাহ্যিক অর্থটিই গ্রহণীয় এবং এর দ্বিতীয় কোন অর্থ গ্রহণ করার সুযোগই এখানে নেই। কাজেই উল্লেখিত দলগুলোর কাফের হওয়া সম্পর্কে কুরআন, হাদীস এবং ইজমার দৃষ্টিতে কোন সন্দেহ নেই। (শিফা দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭০—২৭১ পৃষ্ঠা)

(৯) আল্লামা শাহারিস্তানী (মৃত্যু ঃ ৫৪৮ হিঃ) তাঁর মশহুর কিতাব আল মিলাল ওয়ান নিহালে লিখেছেন ঃ এবং যে এভাবেই বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরও কোন নবী আসবে [হযরত ঈসা (আ) ছাড়া] তার কাফের হওয়া সম্পর্কে যে কোন দু'জন ব্যক্তির মধ্যেই কোন মতবিরোধ থাকতে পারে না। (তৃতীয় খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

(১০) ইমাম রাযী (৫৪৩—৬০৬ হিঃ) তাঁর তাফসীরে কবীরে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ এ বর্ণনায় খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দ এ জন্য বলা হয়েছে যে, যে নবীর পর অন্য কোন নবী আসবেন তিনি যদি উপদেশ এবং নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কিছু অতৃপ্তি রেখে যান, তাহলে তাঁর পর আগমনকারী নবী তা পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু যার পর আর কোন নবী আসবে না, তিনি নিজের উম্মাতের ওপর খুব বেশী স্নেহশীল হন এবং তাদেরকে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব দান করেন। কেননা তাঁর দৃষ্টান্ত এমন এক পিতার ন্যায় যিনি জানেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রের দ্বিতীয় কোন অভিভাবক এবং পৃষ্ঠপোষক থাকবে না। (ষষ্ঠ খণ্ড, ৫৮১ পৃষ্ঠা)

(১১) আল্লামা বায়যাবী (মৃত্যু ঃ ৬৮৫ হিঃ) তাঁর তাফসীরে আনওয়ারুত্ তানজীল–এ লিখেছেন ঃ অর্থাৎ তিনিই শেষ নবী। তিনি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিয়েছেন। অথবা তাঁর কারণেই নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগানো হয়েছে। এবং তাঁর পর হযরত ঈসার (আ) নাযিল হবার কারণে খতমে নবুওয়াতের ওপর কোন দোষ আসছে না। কেননা তিনি রসূলুল্লাহর (সা) দীনের মধ্যেই নাযিল হবেন। (চতুর্থ খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

(১২) আল্লামা হাফেয উদ্দীন নাসাফী (মৃত্যু ঃ ৮১০ হিঃ) তাঁর তাফসীরে মাদারেকুত তানজীল–এ লিখেছেন ঃ এবং রসূলুল্লাহ (সা) খাতামুন নাবিয়্যীন। অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন ব্যক্তিকে নবী করা হবে না। হযরত ঈসার (আ) ব্যাপার হলো এই যে, তাঁকে রসূলুল্লাহ্‌র পূর্বে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এবং পরে যখন তিনি নাযিল হবেন, তখন তিনি হবেন রসূলুল্লাহর শরীয়াতের অনুসারী। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহ্‌র উম্মাত। (৪৭১ পৃষ্ঠা)

(১৩) আল্লামা আলাউদ্দীন বাগদাদী (মৃত্যু ঃ ৭২৬ হিঃ) তাঁর তাফসীরে 'খাজিন'–এ লিখেছেন ঃ وخاتم النبين অর্থাৎ আল্লাহ রসূলুল্লাহ্‌র নবুওয়াত খতম করে দিয়েছেন। কাজেই তাঁর পরে আর কোন নবুওয়াত নেই এবং এ ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদারও নয়। وكان الله بكل شيى عليما অর্থাৎ 'আল্লাহ একথা জানেন যে, তাঁর পর আর কোন নবী নেই' (৪৭১—৪৭২ পৃষ্ঠা)

(১৪) আল্লামা ইবনে কাসীর (মৃত্যু ঃ ৭৭৪ হিঃ) তাঁর মশহুর তাফসীরে লিখেছেন ঃ অতপর আলোচ্য আয়াত থেকে একতা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যখন রসূলুল্লাহ্‌র পর কোন নবী নেই, তখন অপর কোন রসূলেরও প্রশ্ন উঠতে পারে না। কেননা রিসালাত একটা বিশেষ পদমর্যাদা এবং নবুয়াতের পদমর্যাদা এর চাইতে বেশী সাধারণধর্মী। প্রত্যেক রসূল নবী হন, কিন্তু প্রত্যক নবী রসূল হন না। রসূলুল্লাহর পর যে ব্যক্তিই এই পদমর্যাদার দাবী করবে, সেই হবে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল এবং গোমরাহ। যতোই সে আলৌকিক ক্ষমতা ও যাদুর ক্ষমতাসম্পন্ন হোক না কেন, তার দাবী মানবার নয়। কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ব্যক্তি এই পদমর্যাদার দাবী করবে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা হবে এই ধরনের। (তৃতীয় খণ্ড, ৪৯৩—৪৯৪ পৃষ্ঠা)

(১৫) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যু ঃ ৯১১ হিঃ) তাঁর তাফসীরে জালালাইন–এ লিখেছেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন, রসূলুল্লাহর (সা) পর আর কোন নবী নেই। এবং হযরত ঈসা (আ) নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহর শরীয়াত মোতাবেকই আমল করবেন।' (৭৬৮ পৃষ্ঠা)

(১৬) আল্লামা ইবনে নুজাইম (মৃত্যু ঃ ৯৭০ হিঃ) উসূলে ফিকাহর বিখ্যাত গ্রন্থ আল ইশবাহ ওয়ান নাযায়েরে 'কিতাবুস সিয়ারের' 'বাবুর রুইয়ায়' লিখেছেন ঃ যদি কেউ একথা না মনে করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী, তাহলে সে মুসলমান নয়। কেননা কথাগুলো জানা এবং স্বীকার করে নেয়া দীনের অপরিহার্য আকীদা বিশ্বাসের শামিল। (১৭৯ পৃষ্ঠা)

(১৭) মুল্লা আলী কারী (মৃত্যু ঃ ১০১৬ হিঃ) 'শারহে ফিকহে আকবার'–এ লিখেছেন ঃ আমাদের রসূলের (সা) পর অন্য কোন ব্যক্তির নবুওয়াতের দাবী করা সর্ববাদীসম্মতভাবে কুফর। (২০২ পৃষ্ঠা)

(১৮) শায়খ ইসমাইল হাক্কী (মৃত্যু ঃ ১১৩৭ হিঃ) তাফসীরে রুহুল বয়ান–এ উল্লেখিত ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন ঃ আলেম সমাজ 'খাতাম' শব্দটির (ت) তা–এর ওপর জবর লাগিয়ে পড়েছেন,—এর অর্থ হয় খতম করবার যন্ত্র, যার সাহায্যে মোহর লাগানো হয়। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) সমস্ত নবীর শেষে এসেছেন এবং তাঁর সাহায্যে নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ফারসীতে আমরা একে বলবো 'মোহরে পয়গম্বর' অর্থাৎ তাঁর সাহায্যে নবুওয়াতের দরজা মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং পয়গম্বরদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। অন্য পাঠকরা 'তা'–এর নীচে জের লাগিয়ে পড়েছেন 'খাতিমুন নাবিয়্যীন'। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ ছিলেন মোহর দানকারী। অন্যকথায় বলা যাবে, পয়গম্বরদের ওপর মোহরকারী। এভাবে এ শব্দার্থ 'খাতাম'–এর সমার্থক হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে রসূলুল্লাহর (সা) পর তাঁর উম্মাতের আলেম সমাজ তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাবেন একমাত্র তাঁর প্রতিনিধিত্ব। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথেই নবুওয়াতের উত্তরাধিকারেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর পরে হযরত ঈসার (আ) নাযিল হবার ব্যাপারটি তাঁর নবুওয়াতকে ক্রটিযুক্ত করবে না। কেননা খাতিমুন নাবিয়্যীন হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পর আর কাউকে নবী বানানো হবে না এবং হযরত ঈসাকে (আ) তাঁদের পূর্বেই নবী বানানো হয়েছে। কাজেই তিনি রসূলুল্লাহ্‌র অনুসারীর মধ্যে শামিল হবেন, রসূলুল্লাহর কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন এবং তাঁরই উম্মাতের অন্তরভুক্ত হবেন। তখন হযরত ঈসার (আ) নিকট অহী নাযিল হবে না এবং তিনি কোন নতুন আহকামও জারি করবেন না, বরং তিনি হবেন রসূলুল্লাহর প্রতিনিধি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, আমাদের নবীর পর আর কোন নবী নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী। এবং রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার পরে কোন নবী নেই। কাজেই এখন যে বলবেন মুহাম্মাদ (সা)–এর পর নবী আছে, তাকে কাফের বলা হবে। কেননা সে কুরআনকে অস্বীকার করেছে এবং অনুরূপভাবে সে ব্যক্তিকেও কাফের বলা হবে যে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। কেননা সুস্পষ্ট যুক্তি–প্রমাণের পর হক বাতিল থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা)–এর নবুওয়াতের দাবী করবে, তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে। (২২ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

(১৯) শাহানশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের নির্দেশে বার'শ হিজরীতে পাক–ভারতের বিশিষ্ট আলেমগণ সম্মিলিতভাবে 'ফতোয়ায়ে আলমগিরী' নামে যে কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেন তাতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (সা) শেষ নবী নয়,

তাহলে সে মুসলমান নয় এবং যদি সে বলে যে, আমি আল্লাহর রসূল অথবা পয়গম্বর, তাহলে তার ওপর কুফরীর ফতোয়া দেয়া হবে। (দ্বিতীয় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

(২০) আল্লামা শওকানী (মৃত্যু ঃ ১২৫৫ হিঃ) তাঁর তাফসীর ফাতহুল কাদীরে লিখেছেন ঃ সমগ্র মুসলিম সমাজ 'খাতিম' শব্দটির 'তা'–এর নীচে জের লাগিয়ে পড়েছেন এবং একমাত্র আসেম জবরের সাথে পড়েছেন। প্রথমটার অর্থ হলো এই যে, রসূলুল্লাহ সমস্ত পয়গম্বরকে খতম করেছেন অর্থাৎ তিনি সবার শেষে এসেছেন এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হলো এই যে, তিনি সমস্ত পয়গম্বরদের জন্য মোহর স্বরূপ। এবং এর সাহায্যে নবীদের সিলসিলা মোহর এঁটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের দলটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। (চতুর্থ খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

(২১) আল্লামা আলুসি (মৃত্যু ঃ ১২৮০ হিঃ) তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে লিখেছেন ঃ নবী শব্দটি রসূলের চাইতে বেশী ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক। কাজেই রসূলুল্লাহর খাতিমুন নাবিয়্যীন হবার অর্থ হলো এই যে, তিনি খাতিমুল মুরসালীনও। তিনি শেষ নবী এবং শেষ রসূল—একথার অর্থ হলো এই যে, এ দুনিয়ায় তাঁর নবুওয়াতের গুণে গুণান্বিত হবার পরেই মানুষ এবং জিনের মধ্য থেকে এ গুণটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (২২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহর পর যে ব্যক্তি নবুওয়াতের অহীর দাবী করবে, তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমতের অবকাশ নেই। (২২ খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

"রসূলুল্লাহ শেষ নবী—একথাটি কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, রসূলুল্লাহর সুন্নাত এটিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছে এবং সমগ্র মুসলিম সমাজ এর ওপর আমল করেছে। কাজেই যে ব্যক্তি এর বিরোধী কোন দাবী করবে, তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে" (২২ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)

বাংলা–পাক–ভারত উপমহাদেশ থেকে মরক্কো ও স্পেন এবং তুর্কী থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা এবং মতামত আমি এখানে উল্লেখ করলাম। তাঁদের নামের সাথে সাথে তাঁদের জন্ম এবং মৃত্যু তারিখও উল্লেখ করেছি। এ থেকেই ধারণা করা যাবে যে, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এর মধ্যে শামিল আছেন। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর আলেম সমাজের মতামতও আমি এখানে উল্লেখ করতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই তাঁদেরকে বাদ দিয়েছি। কেননা তাঁরা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সমসাময়িক এবং হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে, মীর্জা সাহেবের বিরোধিতার মনোভাব নিয়েই তাঁরা খতমে নবুওয়াতের এই অর্থ বিবৃত করেছেন। এ জন্য মীর্জা সাহেবের পূর্ববর্তী যুগের আলেম সমাজের মতামতের উদ্ধৃতিই এখানে পেশ করেছি—যেহেতু মীর্জা সাহেবের সাথে তাঁদের বিরোধের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এসব মতামত থেকে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহান একযোগে খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের অর্থ নিয়েছে শেষ নবী। প্রত্যেক যুগের মুসলমানই এ একই আকীদা পোষণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহর পর নবুওয়াতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। একথা তাঁরা একযোগে স্বীকার করে নিয়েছেন

যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নবী অথবা রসূল হবার দাবী করে এবং যে তার দাবীকে মেনে নেয়, সে কাফের হয়ে যায়, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন যুগে সামান্যতম মতবিরোধও সৃষ্টি হয়নি। কাজেই এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক বিবেক–বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই ফায়সালা করতে পারেন যে, 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের যে অর্থ আরবী অভিধান থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআনের আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, রসূলুল্লাহ (সা) নিজেই যা ব্যাখ্যা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যে সম্পর্কে মতৈক্য পোষণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম সমাজ একযোগে দ্ব্যর্থহীনভাবে যা স্বীকার করে আসছেন, তার বিপক্ষে দ্বিতীয় কোন অর্থ গ্রহণ অর্থাৎ কোন নতুন দাবীদারের জন্য নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত করার অবকাশ ও সুযোগ থাকে কি? এবং এই ধরনের লোকদেরকে কেমন করে মুসলমান বলে স্বীকার করা যায়, যারা নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত করার নিছক ধারণাই প্রকাশ করেনি বরং ঐ দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দালানে প্রবেশ করেছে এবং তারা তার 'নবুওয়াতের' ওপর ঈমান পর্যন্ত এনেছে?

এ ব্যাপারে আরো তিনটি কথা বিবেচনা করতে হবে।

আমাদের ঈমানের সংগে আল্লাহর কি কোন শত্রুতা আছে?

প্রথম কথা হলো এই যে, নবুওয়াতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি ইসলামের বুনিয়াদী আকিদার অন্তরভুক্ত, এটি স্বীকার করার বা না করার ওপর মানুষের ঈমান ও কুফরী নির্ভর করে। কোন ব্যক্তি যদি নবী হয় এবং লোকেরা তাঁকে না মানে, তাহলে তারা কাফের হয়ে যায়। আবার কোন ব্যক্তি নবী না হওয়া সত্ত্বেও যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে, তারাও কাফের হয়ে যায়। এ ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে আল্লাহর নিকট থেকে কোন প্রকার অসতর্কতার আশা করা যায় না। যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কোন নবী আসার কথা থাকতো তাহলে আল্লাহ নিজেই কুরআনে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে তা ঘোষণা করতেন। এবং রসূলুল্লাহ কখনো এ দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যেতেন না; যতক্ষণ না তিনি সমগ্র উম্মাতকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত করতেন যে, তাঁর পর আরো নবী আসবেন এবং আমরা সবাই তাঁদেরকে মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। এটা কিভাবে সম্ভব যে, রসূলুল্লাহর (সা) পর নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত থাকবে এবং এই দরজা দিয়ে কোন নবী প্রবেশ করবে, যার ওপর ঈমান না আনলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না। অথচ আমাদের এ সম্পর্কে শুধু বেখবরই রাখা হয়নি বরং আল্লাহ এবং তাঁর রসূল একযোগে এমন সব কথা বলেছেন, যার ফলে তের'শ বছর পর্যন্ত সমস্ত উম্মাত একথা মনে করছিল এবং আজও মনে করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কোন নবী আসবেন না? আমাদের সাথে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের এ ধরনের ব্যবহার কেন হবে? আমাদের দীন এবং ঈমানের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের তো কোন শত্রুতা নেই।

তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনেও নেয়া যায় যে, নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত আছে এবং কোন নবী আসার পর আমরা যদি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে তাঁকে অস্বীকার করে বসি, তাহলে ভয় থাকতে পারে একমাত্র আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের! কিন্তু কিয়ামতের দিন তিনি আমাদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলে, আমরা সোজাসুজি উল্লেখিত রেকর্ডগুলো তাঁর আদালতে পেশ করবো। এ থেকে অন্তত প্রমাণ হয়ে যাবে যে, (মা'আযাল্লাহ) আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতই আমাদের এই কুফরীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, এসব রেকর্ড দেখার পর কোন নতুন নবীর ওপর ঈমান না আনার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেবেন না। কিন্তু যদি সত্যি সত্যিই নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে এবং কোন নতুন নবী যদি না আসতে পারে এবং এসব সত্ত্বেও কেউ কোন নবুওয়াতের দাবীদারের ওপর যদি ঈমান আনে, তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে, এই কুফরীর অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য সে আল্লাহর দরবারে এমন কি রেকর্ড পেশ করতে পারবে, যার ফলে সে মুক্তি লাভের আশা করতে পারে! আদালতে হাযির হবার পূর্বে তার নিজের জবাবদিহির জন্য সংগৃহীত দলিল প্রমাণগুলো এখানেই বিশ্লেষণ করে নেয়া উচিত। এবং আমরা যেসব দলিল–প্রমাণ পেশ করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিবেচনা করা উচিত যে, নিজের জন্য যে সাফাইয়ের ওপর নির্ভর করে সে এ কাজ করছে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এর ওপর নির্ভর করে কুফরীর শাস্তি ভোগ করার বিপদকে স্বাগতম জানাতে পারে?

এখন নবীর প্রয়োজনটাই বা কেন?

দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, ইবাদাত এবং নেক কাজে তরক্কী করে কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে নবুওয়াতের গুণ পয়দা করতে পারে না। নবুওয়াতের যোগ্যতা কোন অর্জন করার জিনিস নয়। কোন বিরাট খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ মানুষকে নবুওয়াত দান করা হয় না। বরং বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আল্লাহ কোন বিশেষ ব্যক্তিকে এই মর্যাদা দান করে থাকেন। এ প্রয়োজনের সময় যখন উপস্থিত হয় তখনই আল্লাহ এক ব্যক্তিকে এ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যখন প্রয়োজন পড়ে না অথবা থাকে না, তখন খামখা আল্লাহ নবীর পর নবী প্রেরণ করতে থাকেন না। কুরআন মজিদ থেকে যখন আমরা একথা জানবার চেষ্টা করি যে, কোন্ পরিস্থিতিতে নবী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেখানে এ ধরনের চারটি অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

এক ঃ কোন বিশেষ জাতির মধ্যে নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কোন নবী আসেনি এবং অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রেরিত নবীর পয়গামও তাদের নিকট পৌঁছেনি।

দুই ঃ নবী পাঠাবার প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জাতি ইতিপূর্বে প্রেরিত নবীদের শিক্ষা ভুলে যায় অথবা তা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তিন ঃ ইতিপূর্বে প্রেরিত নবীদের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং দীনের পূর্ণতার জন্য অতিরিক্ত নবীর প্রয়োজন হয়।

চার ঃ কোন নবীর সংগে তাঁর সাহায্য–সহযোগিতার জন্য আর একজন নবীর প্রয়োজন হয়।

এখন একথা সুস্পষ্ট যে, ওপরের এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কোনটিও আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর বিদ্যমান নেই।

কুরআন নিজেই বলছে, রসূলুল্লাহকে সমগ্র দুনিয়ার জন্য হিদায়াতকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। দুনিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাস একথা বলে যে, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র দুনিয়ায় এমন অবস্থা বিরাজ করছে, যাতে করে তাঁর দাওয়াত সবসময় দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে পৌঁছতে পারে। এর পরেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক পয়গম্বর প্রেরণের কোন প্রয়োজন থাকে না।

কুরআন একথাও বলে এবং একই সংগে হাদীস এবং সীরাতের যাবতীয় বর্ণনাও একথার সাক্ষবহ যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা পুরোপুরি নির্ভুল এবং নির্ভেজাল আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোন প্রকার বিকৃতি বা রদবদল হয়নি। তিনি যে কুরআন এনেছিলেন, তার মধ্যে আজ পর্যন্ত একটি শব্দেরও কম–বেশী হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্তও তা হতে পারে না। নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, তাও আজ আমরা এমনভাবে পেয়ে যাচ্ছি, যেন আমরা তাঁরই যুগে বাস করছি। কাজেই দ্বিতীয় প্রয়োজনটাও খতম হয়ে গেছে।

আবার কুরআন মজীদ স্পষ্টভাষায় একথাও ব্যক্ত করে যে, রসূলুল্লাহর (সা) মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। কাজেই দীনের পূর্ণতার জন্যও এখন আর কোন নবীর প্রয়োজন নেই।

এখন বাকি থাকে চতুর্থ প্রয়োজনটি। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো এই যে, এ জন্য যদি কোন নবীর প্রয়োজন হতো তাহলে রসূলুল্লাহর (সা) যুগে তাঁর সংগেই তাকে প্রেরণ করা হতো। কিন্তু একথা সবাই জানেন যে, এমন কোন নবী রসূলুল্লাহর (সা) যুগে প্রেরণ করা হয়নি। কাজেই এ কারণটা বাতিল হয়ে গেছে।

এখন আমরা জানতে চাই, রসূলুল্লাহর (সা) পর আর একজন নতুন নবী আসার পঞ্চম কারণটা কি? যদি কেউ বলে, সমগ্র উম্মাত বিগড়ে গেছে, কাজেই তাদের সংস্কারের জন্য আর একজন নতুন নবীর প্রয়োজন, তাহলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করবো ঃ নিছক সংস্কারের জন্য দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কি কোন নবী এসেছে যে শুধু এই উদ্দেশ্যেই আর একজন নতুন নবীর অবির্ভাব হলো? অহী নাযিল করার জন্যই তো নবী প্রেরণ করা হয়। কেননা নবীর নিকটেই অহী নাযিল করা হয়। আর অহীর প্রয়োজন পড়ে কোন নতুন পয়গাম দেবার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহর কুরআন এবং রসূলুল্লাহর সুন্নাত সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর যখন আল্লাহর দীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং অহীর সমস্ত সম্ভাব্য প্রয়োজন খতম হয়ে গেছে, তখন সংস্কারের জন্য একমাত্র সংস্কারের প্রয়োজনই বাকী রয়ে গেছে—নবীর প্রয়োজন নয়।

নতুন নবুওয়াত বর্তমানে মুসলমানদের জন্য রহমত নয়, লা'নতের শামিল

তৃতীয় কথা হলো এই যে, যখনই কোন জাতির মধ্যে নবীর আগমন হবে, তখনই সেখানে প্রশ্ন উঠবে কুফর ও ঈমানের। যারা ঐ নবীকে স্বীকার করে নেবে, তারা এক উম্মাতভুক্ত হবে এবং যারা তাকে অস্বীকার করবে তারা অবশ্যই একটি পৃথক উম্মাতে শামিল হবে। এই দুই উম্মাতের মতবিরোধ কোন আংশিক মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না বরং এটি এমন একটি বুনিয়াদী মতবিরোধের পর্যায়ে নেমে আসবে, যার ফলে তাদের একটি দল যতদিন না নিজের আকিদা–বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা দু'দল কখনো একত্র হতে পারবে না। এ ছাড়াও কার্যত তাদের প্রত্যেকের জন্য হিদায়াত এবং আইনের উৎস হবে বিভিন্ন। কেননা একটি দল তাদের নিজেদের নবীর অহী এবং সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়ন করবে এবং দ্বিতীয় দলটি এ দু'টিকে তাদের আইনের উৎস হিসেবে মেনে নিতেই প্রথমত অস্বীকার করবে। কাজেই তাদের উভয়ের সম্মিলনে একটি সমাজ সৃষ্টি কখনো সম্ভব হবে না।

এই প্রোজ্জ্বল সত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর যে কোন ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, 'খত্‌মে নবুওয়াত' মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহর একটি বিরাট রহমত স্বরূপ। এর বদৌলতেই সমগ্র মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে শামিল হতে পেরেছে। এ জিনিসটা মুসলমানদেরকে এখন সব মৌলিক মতবিরোধ থেকে রক্ষা করেছে, যা তাদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের বীজ বপন করতো। কাজেই যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত দানকারী এবং নেতা বলে স্বীকার করে এবং তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কোন হিদায়াতের উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায় না, সে আজ এই ভ্রাতৃত্বের অন্তরভুক্ত হতে পারবে। নবুওয়াতের দরজা বন্ধ না হয়ে গেলে মুসলিম জাতি কখনো এই ঐক্যের সন্ধান পেতো না। কেননা প্রত্যেক নবীর আগমনের পর এ ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।

ভাবনা–চিন্তা করলে মানুষের বিবেক–বুদ্ধিও একথাই সমর্থন করে যে, একটি বিশ্বজনীন এবং পরিপূর্ণ দীন দিয়ে দেবার এবং তাকে সকল প্রকার বিকৃতি ও রদবদল থেকে সংরক্ষিত করার পর নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। এর ফলে সম্মিলিতভাবে এই শেষ নবীর অনুগমন করে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান চিরকালের জন্য একই উম্মাতের অন্তরভুক্ত থাকতে পারবে এবং বিনা প্রয়োজনে নতুন নতুন নবীদের আগমনে উম্মাতের মধ্যে বারবার বিভেদ সৃষ্টি হতে পারবে না। নবী 'যিল্লী' হোক অথবা 'বুরুজী,' 'উম্মাতওয়ালা,' 'শরীয়াতওয়ালা' এবং 'কিতাবওয়ালা'—যে কোন অবস্থায়ই যিনি নবী হবেন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে প্রেরণ করা হবে, তাঁর আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে এই যে, তাঁকে যারা মেনে নেবে, তারা হবে একটি উম্মাত আর যারা মানবে না তারা কাফের বলে গণ্য হবে। যখন নবী প্রেরণের সত্যিকার প্রয়োজন দেখা যায়, তখন—শুধুমাত্র তখনই—এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়। কিন্তু যখন তাঁর আগমনের কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন আল্লাহর হিকমাত এবং তাঁর রহমতের নিকট কোনক্রমেই আশা করা যায় না যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে খামখা কুফর ও ঈমানের সংঘর্ষে লিপ্ত করবেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি উম্মাতভুক্ত হবার সুযোগ

দেবন না। কাজেই কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয়, মানুষের বিবেক–বুদ্ধিও তাকে নির্ভুল বলে স্বীকার করে এবং তা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ থাকাই উচিত।

'প্রতিশ্রুত মসীহ'-এর তাৎপর্য

নতুন নবুওয়াতের দিকে আহবানকারীরা সাধারণত অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বলে থাকে, হাদীসে 'প্রতিশ্রুত মসীহ' আসবেন বলে খবর দেয়া হয়েছে। আর মসীহ নবী ছিলেন। কাজেই তাঁর আগমনের ফলে খত্‌মে নবুওয়াত কোন দিক দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে না। বরং খত্‌মে নবুওয়াত এবং 'প্রতিশ্রুত মসীহ' এর আগমন দু'টোই সমপর্যায়ে সত্য।

এই প্রসংগে তারা আরো বলে যে, হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম 'প্রতিশ্রুত মসীহ' নন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাদীসে যাঁর আগমনের খবর দেয়া হয়েছে তিনি হলেন 'মাসীলে মসীহ'— অর্থাৎ হযরত ঈসার (আ) অনুরূপ একজন মসীহ। এবং তিনি 'অমুক' ব্যক্তি যিনি সম্প্রতি আগমন করেছেন। তাঁকে মেনে নিলে খত্‌মে নবুওয়াত বিশ্বাসের বিরোধিতা করা হয় না।

এই প্রতারণার পর্দা ভেদ করবার জন্য আমি এখানে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো থেকে এ ব্যাপারে উল্লেখিত প্রামাণ্য হাদীসসমূহ সূত্রসহ নকল করছি। এ হাদীসগুলো প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারবেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছিলেন এবং আজ তাঁকে কিভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে।

হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালামের নুযুল সম্পর্কিত হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْحَرْبَ وَيُفِيْضُ الْمَالَ حَتّٰى لاَ يَقْبَلُهُ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

(بخارى كتاب احاديث الانبياء ، باب نزول عيسى ابن مريم – مسلم ، باب بيان نزول عيسى – ترمذى ابواب الفتن ، باب فى نزول عيسى مسند احمد مرويات ابو هريرة رض)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সেই মহান সত্তার কছম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের

মধ্যে ইবনে মারয়াম ন্যায়বিচারক শাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন। অতপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন।[১] এবং যুদ্ধ খতম করে দেবেন (বর্ণনান্তরে যুদ্ধের পরিবর্তে 'জিযিয়া' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ জিযিয়া খতম করে দেবেন)।[২] তখন ধনের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না এবং (অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছবে যে, মানুষ আল্লাহর জন্য) একটি সিজদা করে নেয়াটাকেই দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর চাইতে বেশী মূল্যবান মনে করবে।

(২) অন্য একটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ....

"ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না........." এবং এরপর উপরোল্লেখিত হাদীসের মতো একই বিষয়বস্তু বলা হয়েছে। (বুখারী, কিতাবুল মাজালিম, বাবু কাসরিস সালিব—ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিতনাতিদ দাজ্জাল)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاَمَامُكُمْ مِنْكُمْ (بخارى ، كتاب احاديث الانبياء – باب نزول عيسى – مسلم ، بيان نزول عيسى-مسند احمد – مرويات ابى هريرة)

১. ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলার এবং শুকর হত্যা করার অর্থ হলো এই যে, একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে ঈসায়ী ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ঈসায়ী ধর্মের সমগ্র কাঠামোটা এই আকীদার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর একমাত্র পুত্রকে [অর্থাৎ হযরত ঈসাকে (আ)] ক্রুশে বিদ্ধ করে 'লানত' পূর্ণ মৃত্যু দান করেছেন। এবং এতেই সমস্ত মানুষের গোনাহর কাফ্‌ফারা হয়ে গেছে। অন্যান্য নবীদের উম্মাতের সংগে ঈসায়ীদের পার্থক্য হলো এই যে, এরা শুধু আকিদাটুকু গ্রহণ করেছে, অতপর আল্লাহর সমস্ত শরীয়াত নাকচ করে দিয়েছে। এমনকি শুকরকেও এরা হালাল করে নিয়েছে—যা সকল নবীর শরীয়াতে হারাম। কাজেই হযরত ঈসা (আ) নিজে এসে যখন বলবেন, আমি আল্লাহর পুত্র নই, আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়নি এবং আমি কারো গোনাহর কাফ্‌ফারা হইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদই সমূলে উৎপাটিত হবে। অনুরূপভাবে যখন তিনি বলবেন, আমার অনুসারীদের জন্য আমি শুকর হালাল করিনি এবং তাদেরকে শরীয়াতের বিধিনিষেধ থেকে মুক্তিও দেইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্টও নির্মূল হয়ে যাবে।

২. অন্য কথায় বলা যায়, তখন ধর্মের বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষ একমাত্র দীন ইসলামের অন্তরভুক্ত হবে। এর ফলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না এবং কারো কাছ থেকে জিযিয়াও আদায় করা হবে না। পরবর্তী ৫ এবং ১৫ নং হাদীস একথাই প্রমাণ করেছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কেমন হবে তোমরা যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম নিজেদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন?[১]

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَمْحُوا الصَّلِيْبَ وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلٰوةُ وَيُعْطِى الْمَالَ حَتّٰى لاَ يُقْبَلُ وَيَضَعُ الْخَرَاجَ وَيَنْزِلُ الرَّوْحَاءَ فَيَحُجُّ مِنْهَا ، اَوْ يَعْتَمِرُ ، اَوْ يُجْمَعُهَا (مسند احمد ، بسلسله مرويات ابى هريرة رض - مسلم ، كتاب الحج باب جواز التمتع فى الحج والقران)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন। অতপর তিনি শুকর হত্যা করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন। তাঁর জন্য একাধিক নামায এক ওয়াক্তে পড়া হবে। তিনি এতো ধন বিতরণ করবেন যে, অবশেষে তার গ্রহীতা পাওয়া যাবে না। তিনি খিরাজ মওকুফ করে দেবেন। রওহা[২] নামক স্থানে অবস্থান করে তিনি সেখান থেকে হজ্ব অথবা ওমরাহ করবেন অথবা দু'টোই করবেন।[৩] (রসূলুল্লাহ এর মধ্যে কোনটি বলেছিলেন—এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়ে গেছে।)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (بعد ذكر خروج الدجال) فَبَيْنَمَا هُمْ يُعَدُّوْنَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَيَنْزِلَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَاَمَّهُمْ فَاِذَا رَاٰهُ عَدُوُّ اللّٰهِ يَنْذُوْبُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لاَنْذَابَ حَتّٰى يُهْلَكَ وَلٰكِن يَّقْتُلُهُ اللّٰهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِىْ حَرْبَتِهِ (مشكواة - كتاب الفتن ، باب الملاحم ، بحواله مسلم)

১. অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) নামাযে ইমামতি করবেন না। মুসলমানদের পূর্ব নিযুক্ত ইমামের পেছনে তিনি এক্তেদা করবেন।

২. রওহা মদীনা থেকে ২৫ মাইল দূরে একটি স্থানের নাম।

৩. উল্লেখ্য এ যুগে যাকে "মাসীলে মাসীহ" গণ্য করা হয়েছে তিনি জীবনে কোনদিন হজ্ব বা উমরাহ কোনটাই করেননি।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, দাজ্জালের আবির্ভাব বর্ণনার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ইত্যবসরে যখন মুসলমানরা তার সংগে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকবে, কাতারবন্ধ হতে থাকবে এবং নামাযের জন্য 'একামাত' পাঠ করা শেষ হবে, তখন ঈসা ইবনে মার্‌য়াম অবতীর্ণ হবেন এবং নামাযে মুসলমানদের ইমামতি করবেন। আল্লাহর দুশমন দাজ্জাল তাঁকে দেখতেই এমনভাবে গলিত হতে থাকবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ঈসা (আ) তাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, তাহলেও সে বিগলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাকে হযরত ঈসার (আ) হাতে কতল করবেন তিনি দাজ্জালের রক্তে রঞ্জিত নিজের বর্শাফলক মুসলমানদের দেখাবেন।

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ نَبِىٌّ (يعنى عيسى) وَاِنَّهُ نَازِلٌ فَاِذَا رَاَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَاَنَّ رَاْسَهُ يَقْطُرُ وَاِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلَ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعِ الْجِزْيَةُ وَيُهْلِكَ اللّٰهُ فِىْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا اِلاَّ الْاِسْلَامَ وَيُهْلِكَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفَّى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ - (ابو داؤد ، كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال ، مسند احمد ، مرويات ابو هريرة)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার এবং তাঁর (অর্থাৎ হযরত ঈসার) মাঝখানে আর কোন নবী নেই। এবং তিনি অবতীর্ণ হবেন। তাঁকে দেখা মাত্রই তোমরা চিনে নিয়ো। তিনি মাঝারি ধরনের লম্বা হবেন। বর্ণ লাল সাদায় মেশানো। পরনে দু'টো হলুদ রঙের কাপড়। তাঁর মাথার চুল থেকে মনে হবে এই বুঝি পানি টপকে পড়লো। অথচ তা মোটেই সিক্ত হবে না। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের সংগে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করবেন। শুকর হত্যা করবেন। জিযিয়া কর রহিত করবেন। তাঁর যামানায় আল্লাহ ইসলাম ছাড়া সমস্ত ধর্মকেই নির্মূল করবেন। তিনি মাসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং দুনিয়ায় চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতপর তাঁর ইন্তেকাল হবে এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযার নামায পড়বে।

(٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيَقُوْلُ اَمِيْرُهُمْ

تَعَالَ فَصَلِّ فَيَقُوْلُ لاَ اِنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ اُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ - (مسلم ، بيان نزول عيسى ابن مريم - مسند احمد بسلسةُ مرويات جابر بن عبد اللّٰه)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ...........অতপর ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, আসুন, আপনি নামায পড়ান। কিন্তু তিনি বলবেন, না তোমরা নিজেরাই একে অপরের আমীর[১] আল্লাহ এই উম্মাতকে যে ইজ্জত দান করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একথা বলবেন।

(٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (فى قصة ابن صياد) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ائْذَنِ لِىْ فَاَقْتُلُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ يَّكُنْ هُوَ فَلَسْتَ صَاحِبُهُ ، اِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ ، وَاِنْ لاَ يَكُنْ فَلَيْسَ لَكَ اَنْ تَقْتُلَ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْعَهْدِ (مشكواة ، كتاب الفتن ، باب قصه ابن صياد ، بحو له شرح السنه بغوى)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (ইবনে সাইয়াদ প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, অতপর উমর ইবনে খাত্তাব আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল। অনুমতি দিন, আমি তাকে কতল করি। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি এ সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এর হত্যাকারী নও, বরং ঈসা ইবনে মারয়াম একে হত্যা করবেন এবং যদি এ সেই ব্যক্তি না হয়ে থাকে, তাহলে জিম্মীদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করার তোমাদের কোন অধিকার নেই।

(٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (فى قصة الدجال) فَاِذَا هُمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَتُقَامُ الصَّلٰوةُ فَيُقَالُ لَهُ تَقَدَّمْ يَارُوْحَ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ لِيَتَقَدَّمْ اِمَامُكُمْ فَلْيُصَلِّ بِكُمْ فَاِذَا صَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ خَرَجُوْا اِلَيْهِ قَالَ فَحِيْنَ يَرَى الْكَذَّابَ يَنْمَاثُ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ فَيَمْشِى اِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ حَتّٰى اِنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ يُنَادِى يَارُوْحَ

১. অর্থাৎ তোমাদের আমীর তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত।

اللّٰهِ هٰذَا الْيَهُودِىُّ فَلاَ يَتْرُكُ مِمَّنْ كَانَ يَتْبَعُهُ اَحَدًا اِلاَّ قَتَلَهُ (مسند احمد ، بسلسله روايات جابر بن عبد الله)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, (দাজ্জাল প্রসংগে রসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ) সেই সময় ঈসা ইবনে মার্য়াম হঠাৎ মুসলমানদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। অতপর লোকেরা নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তাঁকে বলা হবে, হে রূহুল্লাহ! অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি বলবেন, না, তোমাদের ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া উচিত, তিনিই নামায পড়াবেন। অতপর ফজরের নামাযের পর মুসলমানরা দাজ্জালের মোকাবিলায় বের হবে।(রসূলুল্লাহ) বলেছেন ঃ যখন সেই কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) হযরত ঈসাকে দেখবে, তখন বিগলিত হতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। অতপর তিনি দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাকে কতল করবেন। তখন অবস্থা এমন হবে যে, গাছপালা এবং প্রস্তরখণ্ড চিৎকার করে বলবে, হে রুহুল্লাহ! ইহুদীটা এই আমার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে! দাজ্জালের অনুগামীদের কেউ বাঁচবে না, সবাইকে কতল করা হবে।

(١٠) عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ (فى قصة الدجال) فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ ابْنِ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَاةِ الْبَيْضَاءَ شَرْقِىِّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ اِلاَّ مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِى اِلٰى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ - (مسلم ، ذكر الدجال ، ابو داؤد ، كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال - ترمذى - ابواب الفتن ، باب فى فتنة الدجال - ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب فتنة الدجال)

হযরত নওয়াস ইবনে সাম'আন কেলাবী (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন যে, (রসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ) দাজ্জাল যখন এসব করতে থাকবে, ইত্যবসরে আল্লাহ মাসীহ ইবনে মার্য়ামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশকের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের সন্নিকটে দু'টো হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে নামবেন। তিনি মাথা নীচু করলে পানি টপকাচ্ছে বলে মনে হবে। আবার মাথা উঁচু করলে মনে হবে যেন বিন্দু বিন্দু পানি মোতির মতো চমকাচ্ছে। তাঁর নিশ্বাসের হাওয়া যে

কাফেরের গায়ে লাগবে—এবং এর গতি হবে তাঁর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত—সে জীবিত থাকবে না। অতপর ইবনে মারয়াম দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং লুদের[১] দ্বারপ্রান্তে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করবেন।

(١١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِىْ اُمَّتِىْ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ (لاَ اَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ عَامًا) فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسٰى ابْنَ مَرْيَمَ كَاَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسَ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ – مسلم ، ذكر الدجال)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : দাজ্জাল আমার উম্মাতের মধ্যে বের হবে এবং চল্লিশ (আমি জানি না চল্লিশ দিন, চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর)[২] অবস্থান করবে। অতপর আল্লাহ ঈসা ইবনে মারয়ামকে পাঠাবেন। তাঁর চেহারা উরওয়া ইবনে মাসউদের (জনৈক সাহাবী) মতো। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন অবস্থায় থাকবে যে, দু'জন লোকের মধ্যে শত্রুতা থাকবে না।

(١٢) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ الْغِفَارِىْ قَالَ اَطَّلَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذْكُرُوْنَ – قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ – قَالَ اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ ايَات – فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَثَلٰثَةُ خُسُوْفٌ ، خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرْبِ وَاخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلَى مَحْشَرِهِمْ (مسلم : كتاب الفتن واشراط الساعه ابو داؤد ، كتاب الملاحم ، باب امارات الساعه)

১. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লুদ (Lydda) ফিলিস্তিনের অন্তর্গত বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী তেলআবীব থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ইহুদীরা এখানে একটি বিরাট বিমান বন্দর নির্মাণ করেছে।

২. এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের নিজের বক্তব্য।

হযরত হুযাইফা ইবনে আসীদ আল গিফারী (রা) বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মজলিসে তাশরীফ আনলেন। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় লিপ্ত ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি আলোচনা করছো? লোকেরা বললো, আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করছি। তিনি বললেন ঃ দশটি নিশানা প্রকাশ না হবার পূর্বে তা কখনো কায়েম হবে না। অতপর তিনি দশটি নিশানা বলে গেলেন। এক ঃ ধোঁয়া, দুই ঃ দাজ্জাল, তিন ঃ দাব্বাতুল আরদ, চার ঃ পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়, পাঁচ ঃ ঈসা ইবনে মার্‌য়ামের অবতরণ, ছয় ঃ ইয়াজুজ ও মাজুজ, সাত ঃ তিনটি প্রকাণ্ড ভূমি ধস (Landslide) একটি পূর্বে, আট ঃ একটি পশ্চিমে, নয়ঃ আর একটি আরব উপদ্বীপে, দশ ঃ সর্বশেষ একটি প্রকাণ্ড অগ্নি ইয়েমেন থেকে উঠবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানের দিকে।

(١٣) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِصَابَتَانِ مِنْ اُمَّتِىْ اَحْرَزَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُوا الْهِنْدَ ، وَعِصَابَةٌ تَكُوْنُ مَعَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ،(نسائى ، كتاب الجهاد - مسند احمد ، بسلسلة روايات ثوبان)

রসূলুল্লাহর (সা) আজাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মাতের দু'টো সেনাদলকে আল্লাহ দোজখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একটি হলো—যারা হিন্দুস্তানের ওপর হামলা করবে আর দ্বিতীয়টি ঈসা ইবনে মার্‌য়ামের সংগে অবস্থানকারী।

(١٤) عَنْ مَجْمَعِ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ (مسند احمد - ترمذى ابواب الفتن)

মুজামে' ইবনে জারিয়া আনসারী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ ইবনে মার্‌য়াম দাজ্জালকে লুদের দারপ্রান্তে কতল করবেন।

(١٥) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ (فى حديث طويل فى ذكر الدجال) فَبَيْنَمَا اَمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّى بِهِمُ الصُّبْحَ اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَرَجَعَ ذٰلِكَ الْاِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِىْ قَهْقَرٰى لِيُتَقَدَّمَ

عِيْسٰى فَيَضَعُ عِيْسٰى يَدَهُ بَيْنَ كِتَفَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ اُقِيْمَتْ فَيُصَلِّى بِهِمْ اِمَامُهُمْ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ افْتَحُوا الْبَابَ فَيَفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ وَمَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ يَهُوْدِيٍّ كُلُّهُمْ ذُوْ سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ فَاِذَا نَظَرَ اِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُوْلُ عِيْسٰى اِنَّ لِىْ فِيْكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِى بِهَا فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِى فَيَهْزِمُ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ...... وَتَمْلَاَ الْاَرْضُ مِنَ الْمُسْلِمِ كَمَا يَمْلَا الْاِنَاءَ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰى (ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب فتنة الدجال)

আবু উমামা বাহেলী (এক দীর্ঘ হাদীসে দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন ঃ ফজরের নামায পড়বার জন্য মুসলমানদের ইমাম যখন অগ্রবর্তী হবেন, ঠিক সে সময় ঈসা ইবনে মারয়াম তাদের ওপর অবতীর্ণ হবেন। ইমাম পিছনে সরে আসবেন ঈসাকে (আ) অগ্রবর্তী করার জন্য কিন্তু ঈসা (আ) তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলবেন ঃ না, তুমিই নামায পড়াও। কেননা এরা তোমার জন্যই দাঁড়িয়েছে। কাজেই তিনিই (ইমাম) নামায পড়াবেন। সালাম ফেরার পর ঈসা (আ) বলবেন ঃ দরজা খোলো। দরজা খোলা হবে। বাইরে দাজ্জাল ৭০ হাজার সশস্ত্র ইহুদী সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করবে। তার দৃষ্টি হযরত ঈসার (আ) ওপর পড়া মাত্রই সে এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। এবং সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। ঈসা (আ) বলবেন ঃ আমার নিকট তোর জন্য এমন এক আঘাত আছে যার হাত থেকে তোর কোনক্রমেই নিষ্কৃতি নেই। অতপর তিনি তাকে লুদের পূর্ব দ্বারদেশে গিয়ে গ্রেফতার করবেন এবং আল্লাহ ইহুদীদেরকে পরাজয় দান করবেন.........এবং যমীন মুসলমানদের দ্বারা এমনভাবে ভরপুর হবে যেমন পাত্র পানিতে ভরে যায়। সবাই একই কালেমায় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করা হবে না।

(١٦) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ .... وَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَيَقُوْلُ لَهُ اَمِيْرُهُمْ يَارُوْحَ اللّٰهِ تَقَدَّمْ ، صَلِّ ، فَيَقُوْلُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ بَعْضُهُمْ اُمَرَاءُ عَلٰى بَعْضٍ فَيَتَقَدَّمُ اَمِيْرُهُمْ

فَيُصَلِّى فَاِذَا قَضٰى صَلٰوتَـهُ اَخَذَ عِيْسٰى حَرْبَتَهُ فيذهب نحوا لرجال فاذا يراه الرجال ذاب كما يذوب الرَّصاص فيضع حربه بين شُنْدُوَيْته فَيَقْتُلُهُ وَيَنْهَزِمُ اَصْحَابُهُ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ يُوَارِى مِنْهُمْ اَحَدًا حَتّٰى اِنَّ الشَّجَرَ لِيَقُوْلُ يَا مُؤْمِنُ هٰذَا كَافِرٌ وَيَقُوْلُ الْحَجَرُ يَا مُؤْمِنُ هٰذَا كَافِرٌ (مسند احمد - طبرانى - حاكم)

উসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ.........এবং ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালাম ফজরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, হে রূহুল্লাহ! আপনি নামায পড়ান! তিনি জবাব দেবেন ঃ এই উম্মাতের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের আমীর। তখন মুসলমানদের আমীর অগ্রবর্তী হয়ে নামায পড়াবেন। অতপর নামায শেষ করে ঈসা (আ) নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন। সে যখন তাঁকে দেখবে তখন এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে যেমন সীসা গলে যায়। তিনি নিজের অস্ত্র দিয়ে দাজ্জালকে কতল করবেন এবং তার দলবল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। কিন্তু কোথাও তারা আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না। এমন কি বৃক্ষও চিৎকার করে বলবে ঃ হে মু'মিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে। এবং প্রস্তর খণ্ডও চিৎকার করে বলবে ঃ হে মু'মিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে।

(١٧) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فى حديث طويل) فيصبح فِيْهِمْ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَيَهْزِمُهُ اللّٰهُ وَجُنُوْدُهُ حَتّٰى اَنْ اَجْذُمِ الْحَائِطِ وَاَصْلُ الشَّجَرِ لَيُنَادِى يَا مُؤْمِنُ هٰذَا كَافِرٌ يَسْتَتِرُ بِىْ فَتَعَالَ اُقْتُلْهُ (مسند احمد - حاكم)

সামুরা ইবনে জুনদুব (এক দীর্ঘ হাদীসে) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর সকাল বেলা ঈসা ইবনে মারয়াম মুসলমানদের মধ্যে আসবেন এবং আল্লাহ দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনীকে পরাজয় দান করবেন। এমন কি প্রাচীর এবং বৃক্ষের কাণ্ডও ফুকারে বলবে ঃ হে মু'মিন, এখানে কাফের আমার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। এসো একে কতল করো!

(١٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ (مسند احمد)

ইমরান ইবনে হাসীন বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে হামেশা একটি দল হকের ওপর কায়েম থাকবে এবং তারা বিরোধী দলের ওপর প্রতিপত্তি বিস্তার করবে। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা এসে যাবে এবং ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সাল্লাম অবতীর্ণ হবেন।

(১৯) عَنْ عَائِشَةَ (فى قصة الدجال) فَيَنْزِلُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اِمَامًا عَادِلاً وَحَكَمًا مُقْسِطًا (مسند احمد)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অতপর ঈসা (আ) চল্লিশ বছর আদেল ইমাম এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে দুনিয়ায় অবস্থান করবেন।

(২০) عَنْ سَفِيْنَةَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فى قصة الدجال) فَيَنْزِلُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَقْتُلُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عِنْدَ عَقَبَةِ اَفِيْقَ (مسند احمد)

রসূলুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম সাফীনা (রা) (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহ আফিয়েকের পার্বত্য পথের[১] সন্নিকটে তাকে (দাজ্জালকে) মেরে ফেলবেন।

(২১) عَنْ حُذَيْفَةَ (فى ذكر الدجال) فَلَمَّا قَامُوْا يُصَلُّوْنَ نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِمَامُهُمْ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ هٰكَذَا فَرِجُوْا بَيْنِى وَبَيْنَ عَدُوِّ اللّٰهِ .... وَيُسَلِّطُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَقْتُلُوْنَهُمْ حَتّٰى اَنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ لَيُنَادِى يَا عَبْدَ اللّٰهِ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ يَا مُسْلِمُ هٰذَا الْيَهُوْدِىُّ فَاقْتُلْهُمْ فَيُفْنِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى

১. আফিয়েককে বর্তমানে ফায়েক বলা হয়। সিরিয়া এবং ইসরাঈল সীমান্তে বর্তমান সিরিয়া রাষ্ট্রের সর্বশেষ শহর। এরপরে পশ্চিমের দিকে কয়েক মাইল দূরে তাবারিয়া নামক হ্রদ আছে। এখানেই জর্দান নদীর উৎপত্তিস্থল। এর দক্ষিণ–পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যভাগে নিম্ন ভূমিতে একটি রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তাটি প্রায় দেড় হাজার ফুট গভীরে নেমে গিয়ে সেই স্থানে পৌঁছায় যেখান থেকে জর্দান নদী তাবারিয়ার মধ্য হতে নির্গত হচ্ছে। এ পার্বত্য পথকেই বলা হয় "আকাবায়ে আফিয়েক" (উফায়েকের নিম্ন পার্বত্য পথ)।

وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُوْنَ فَيُكْسِرُوْنَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُوْنَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُوْنَ الْجِزْيَةَ (مستدرك حاكم)

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতপর যখন মুসলমানরা নামাযের জন্য তৈরি হবে, তখন তাদের চোখের সম্মুখে ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন। তিনি মুসলমানদের নামায পড়াবেন অতপর সালাম ফিরিয়ে লোকদের বলবেন, আমার এবং আল্লাহর এই দুশমনের মাঝখান থেকে সরে যাও.......এবং আল্লাহ দাজ্জালের দলবলের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন।

মুসলমানরা তাদেরকে বেধড়ক হত্যা করতে থাকবে। অবশেষে বৃক্ষ এবং প্রস্তর খণ্ডও চিৎকার করে বলবে ঃ হে আল্লাহর বান্দা, হে রহমানের বান্দা, হে মুসলমান! দেখো, এখানে একজন ইহুদী, একে হত্যা করো। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং মুসলমানগণ বিজয় লাভ করবে। তারা ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে, শূকর হত্যা করবে এবং জিযিয়া মওকুফ করে দেবে।[১]

এ ২১টি হাদীস ১৪ জন সহাবীর মারফত নির্ভুল সনদসহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়াও এ ব্যাপারে আরো অসংখ্য হাদীস অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হবার ভয়ে আমি সেগুলো এখানে উল্লেখ করলাম না। বর্ণনা এবং সনদের দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোই শুধু এখানে উদ্ধৃত করলাম।

এ হাদীসগুলো থেকে কি প্রমাণিত হয়?

যে কোন ব্যক্তি হাদীসগুলো পড়ে নিজেই বুঝতে পারবেন যে, এখানে কোন "প্রতিশ্রুত মসীহ" "মসীলে মসীহ" বা "বুরুজী মসীহ"র কোন উল্লেখই করা হয়নি। এমন কি বর্তমান কালে কোন পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কোন ব্যক্তির একথা বলার অবকাশ নেই যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মসীহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই মসীহ। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে পিতা ছাড়াই হযরত মারয়ামের (আ) গর্ভে যে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল এ হাদীসগুলোর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য থেকে তাঁরই অবতারণের সংবাদ শ্রুত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, না জীবিত অবস্থায় কোথাও রয়েছেন—এ আলোচনা সম্পূর্ণ অবান্তর। তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাহলেও বলা যায় যে, আল্লাহ তাঁকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।[২] উপরন্তু আল্লাহ তাঁর

১. মুসলিমেও হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে এবং হাফেয ইবনে হাজার আস্‌কালানী ফাতহুল বারীর ষষ্ঠ খণ্ডে ৫৫০ পৃষ্ঠায় এটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

২. যারা আল্লাহর এই পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা অস্বীকার করেন তাদের সূরা বাকারার ২৫৯ নম্বর আয়াতটির অর্থ অনুধাবন করা উচিত। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাঁর এক বান্দাকে ১০০ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখার পর আবার তাকে জীবিত করেন।

এক বান্দাকে তাঁর এ বিশাল সৃষ্টি জগতের কোন এক স্থানে হাজার বছর জীবিত অবস্থায় রাখার পর নিজের ইচ্ছামতো যে কোন সময় তাঁকে এই দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনতে পারেন। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রেক্ষিতে একথা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে তাকে অবশ্যই ভবিষ্যতে আগমনকারী ব্যক্তিকে উল্লেখিত ঈসা ইবনে মারয়াম বলে স্বীকার করতেই হবে। তবে যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে সে আদতে কোন আগমনকারীর অস্তিত্বই স্বীকার করতে পারে না। কারণ আগমনকারীর আগমন সম্পর্কে যে বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে হাদীস ছাড়া আর কোথাও তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ অদ্ভুত ব্যাপারটি শুধু এখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আগমনকারীর আগমন সম্পর্কিত ধারণা বিশ্বাস গ্রহণ করা হচ্ছে হাদীস থেকে কিন্তু সেই হাদীসগুলোই আবার যখন সুস্পষ্ট করে এ বক্তব্য তুলে ধরছে যে, উক্ত আগমনকারী কোন 'মসীলে মসীহ' (মসীহ–সম ব্যক্তি) নন বরং তিনি হবেন স্বয়ং ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালাম তখন তা অস্বীকার করা হচ্ছে।

এ হাদীসগুলো থেকে দ্বিতীয় যে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম (আ) দ্বিতীয়বার নবী হিসেবে অবতরণ করবেন না। তাঁর ওপর ওহী নাযিল হবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি কোন নতুন বাণী বা বিধান আনবেন না। শরীয়াতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও তিনি হ্রাস বৃদ্ধি করবেন না। দীন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্যও তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হবে না। তিনি এসে লোকদেরকে নিজের ওপর ঈমান আনার আহবান জানাবেন না এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনবে তাদেরকে নিয়ে একটি পৃথক উম্মাতও গড়ে তুলবেন না।[১] তাঁকে কেবলমাত্র একটি পৃথক দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হবে। অর্থাৎ তিনি দাজ্জালের ফিত্‌নাকে সমূলে বিনাশ করবেন। এ জন্য

---

১. পূর্ববর্তী আলেমগণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লামা তাফ্‌তাযানী (হি ৭২২–৭৯২) শারহে আকায়েদে নাসাফী গ্রন্থে লিখছেন :

ثبت انه اخر الانبياء ....فان قيل قد روى فى الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده قلنا نعم لكنه يتابع محمدا عليه السلام لان شريعته قد نسخت فلا يكون اليه وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة رسول الله عليه السلام (طبع مصر – ص ١٣٥)

"মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী, একথা প্রমাণিত সত্য............ যদি বলা হয়, তাঁর পর হাদীসে হযরত ঈসার (আ) আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাহলে আমি বলবো, হাঁ হযরত ঈসার (আ) আগমনের কথা বলা হয়েছে সত্য, তবে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হবেন। কারণ তাঁর শরীয়াত বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই তাঁর ওপর অহী নাযিল হবে না এবং তিনি নতুন বিধানও নির্ধারণ করবেন না। বরং তিনি মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন।" [মিসরে মুদ্রিত, ১৩৫ পৃষ্ঠা]

আল্লামা আলূসী তাঁর 'রুহুল মা'আনী' নামক তাফসীর গ্রন্থেও প্রায় একই বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন :

ثم انه عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال لكنه لا يتعبد بها لنسخها فى حقه وحق غيره وتكليفه باحكام هذه الشريعة اصلا

তিনি এমনভাবে অবতরণ করবেন যার ফলে তাঁর অবতরণের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশই থাকবে না। যেসব মুসলমানের মধ্যে তিনি অবতরণ করবেন তারা নিসংশয়ে বুঝতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ (সা) যে ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি এবং রসূলুল্লাহর কথা অনুযায়ী তিনি যথা সময়ে অবতরণ করেছেন, তিনি এসে মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাবেন। মুসলমানদের তদানীন্তন ইমামের পিছনে তিনি নামায পড়বেন।[১] তৎকালে মুসলমানদের যিনি নেতৃত্ব দেবেন তিনি তাঁকেই অগ্রবর্তী করবেন যাতে এই ধরনের সন্দেহের কোন অবকাশই না থাকে যে, তিনি নিজের পয়গম্বরী পদমর্যাদা সহকারে পুনর্বার পয়গম্বরীর দায়িত্ব পালন করার জন্য ফিরে এসেছেন। নিসন্দেহে বলা যেতে পারে কোন দলে আল্লাহর পয়গম্বরের উপস্থিতিতে অন্য কোন ব্যক্তি ইমাম বা নেতা হতে পারেন না। কাজেই নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের দলে তাঁর অন্তরভুক্ত স্বতস্ফূর্তভাবে একথাই ঘোষণা করবে যে, তিনি পয়গম্বর হিসেবে আগমন করেননি। এ জন্য তাঁর আগমনে নবুওয়াতের দুয়ার উন্মুক্ত হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

নিসন্দেহে তাঁর আগমন বর্তমান ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র প্রধানের আমলে প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধানের আগমনের সাথে তুলনীয়। এ অবস্থায় প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধান বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে রাষ্ট্রীয়

وفرعا فلا يكون اليه عليه السلام وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته بين امته (جلد ٢٢ ص ٣٢)

"অতপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব প্রদত্ত নবুওয়াতের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কারণ তিনি নিজের আগের পদমর্যাদা থেকেতো অপসারিত হবেন না। কিন্তু নিজের পূর্বের শরীয়াতের অনুসারী হবেন না। কারণ তা তাঁর নিজের ও অন্যসব লোকদের জন্য বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে তিনি মূলনীতি থেকে খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতের অনুসারী হবেন। কাজেই তাঁর নিকট অহী নাযিল হবে না বরং তিনি শরীয়াতের বিধানও নির্ধারণ করবেন না। "বরং তিনি মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি এবং তাঁর উম্মাতের মধ্যস্থিত মুহাম্মাদী মিল্লাতের শাসকদের মধ্য থেকে একজন শাসক হবেন।" [২২শ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা]

ইমাম রাযী একথাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে নিম্নোক্ত ভাষায় পেশ করেছেন ঃ

انتهاء الانبياء الى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعند مبعثه انتهت تلك المدة فلا يبعد ان يصير (اى عيسى بن مريم) بعد نزوله تبعا لمحمد (تفسير كبير ، ج ٣ ، ص ٣٤٣)

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নবীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে হযরত ঈসার (আ) অবতরণের পর তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হবেন একথা মোটেই অযৌক্তিক নয়।" [তাফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা]

১. যদিও দু'টি হাদীসে (৫ ও ২১নং) বলা হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস্ সালাম অবতরণ করার পর প্রথম নামাযটি নিজে পড়াবেন। কিন্তু অধিকাংশ এবং বিশেষ করে শক্তিশালী কতিপয় হাদীস (৩, ৭, ৯, ১৫ ও ১৬নং) থেকে জানা যায় যে, তিনি নামাযে ইমামতি করতে অস্বীকার করবেন এবং মুসলমানদের তৎকালীন ইমাম ও নেতাকে অগ্রবর্তী করবেন। মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ সর্বসম্মতভাবে এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ বোধ সম্পন্ন কোন ব্যক্তি সহজেই একথা বুঝতে পারেন যে, এক রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে অন্য একজন প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধানের নিছক আগমনেই আইন ভেঙ্গে যায় না। তবে দু'টি অবস্থায় আইনের বিরুদ্ধাচরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এক, প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান এসে যদি আবার নতুন করে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন। দুই, কোন ব্যক্তি যদি তাঁর রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও দায়িত্ব অস্বীকার করে বসেন। কারণ এটা হবে তাঁর রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালে যেসব কাজ হয়েছিল সেগুলোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর। এ দু'টি অবস্থার কোন একটি না হলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক আগমনই আইনগত অবস্থাকে কোন প্রকারে পরিবর্তিত করতে পারে না। হযরত ঈসার (আ) দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তাঁর নিছক আগমনেই খত্‌মে নবুওয়াতের দুয়ার ভেঙ্গে পড়ে না। তবে তিনি এসে যদি নবীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন অথবা কোন ব্যক্তি যদি তাঁর প্রাক্তন নবুওয়াতের মর্যাদাও অস্বীকার করে বসে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নবুওয়াত বিধি ভেঙ্গে পড়ে। হাদীসে এ দু'টি পথই পরিপূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হাদীসে একদিকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) পর আর কোন নবী নেই এবং অন্যদিকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, ঈসা আলাইহিস সালাম পুনর্বার অবতরণ করবেন। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, তাঁর এ দ্বিতীয় আগমন নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে হবে না।

অনুরূপভাবে তাঁর আগমনে মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ঈমানের কোন নতুন প্রশ্ন দেখা দেবে না। আজও কোন ব্যক্তি তাঁর পূর্বের নবুওয়াতের ওপর ঈমান না আনলে কাফের হয়ে যাবে। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সা) নিজেও তাঁর ঐ নবুওয়াতের প্রতি ঈমান রাখতেন। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) সমগ্র উম্মাতও শুরু থেকেই তাঁর ওপর ঈমান রাখে। হযরত ঈসার (আ) পুনর্বার আগমনের সময়ও এই একই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। মুসলমানরা কোন নতুন নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে না, বরং আজকের ন্যায় সেদিনও তারা ঈসা ইবনে মারয়ামের (আ) পূর্বের নবুওয়াতের ওপরই ঈমান রাখবে। এ অবস্থাটি বর্তমানে যেমন খত্‌মে নবুওয়াত বিরোধী নয়, তেমনি সেদিনও বিরোধী হবে না।

সর্বশেষ যে কথাটি এ হাদীসগুলো এবং অন্যান্য বহুবিধ হাদীস থেকে জানা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসাকে (আ) যে দাজ্জালের বিশ্বব্যাপী ফিত্‌না নির্মূল করার জন্য পাঠানো হবে সে হবে ইহুদী বংশোদ্ভূত। সে নিজেকে "মসীহ" রূপে পেশ করবে। ইহুদীদের ইতিহাস ও তাদের ধর্মীয় চিন্তা-বিশ্বাস সম্পর্কে অনবহিত কোন ব্যক্তি এ বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর যখন বনী ইসরাঈল ক্রমাগত অবক্ষয় ও পতনের শিকার হতে থাকলো এমন কি অবশেষে ব্যাবিলন ও আসিরিয়া অধিপতিরা তাদেরকে পরাধীন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো এবং দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত করে দিলো, তখন বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদেরকে সুসংবাদ দিতে থাকলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন "মসীহ" এসে তাদেরকে এ চরম লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবেন। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে ইহুদীরা একজন মসীহের আগমনের প্রতীক্ষারত ছিল। তিনি হবেন বাদশাহ। তিনি যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন। বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন দেশ থেকে এনে ফিলিস্তিনে একত্রিত করবেন এবং

তাদের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কায়েম করবেন। কিন্তু তাদের এসব আশা–আকাংখাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন ঈসা ইবনে মারয়াম (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে "মসীহ" হয়ে আসলেন এবং কোন সেনাবাহিনী ছাড়াই আসলেন, তখন ইহুদীরা তাঁকে 'মসীহ' বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল। তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদী দুনিয়া সেই প্রতিশ্রুত মসীহর প্রতিক্ষা (Promised Messiah) করছে, যার আগমনের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সেই কাঙ্খিত যুগের সুখ–স্বপ্ন–কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ। তালমুদ ও রাববীর সাহিত্য গ্রন্থসমূহে এর যে নক্শা তৈরি করা হয়েছে তার কল্পিত স্বাদ আহরণ করে শত শত বছর থেকে ইহুদী জাতি জীবন ধারণ করছে। তারা বুক ভরা আশা নিয়ে বসে আছে যে, এ প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন একজন শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি নীল নদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা, (যে এলাকাটিকে ইহুদীরা নিজেদের "উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এলাকা" মনে করে) আবার ইহুদীদের দখলে আনবেন এবং সারা দুনিয়া থেকে ইহুদীদেরকে এনে এখানে একত্রিত করবেন।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মহানবীর (সা) কথামত ইহুদীদের "প্রতিশ্রুত মসীহর" ভূমিকা পালনকারী প্রধানতম দাজ্জালের আগমনের জন্য মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনের বৃহত্তর এলাকা থেকে মুসলমানদেরকে বেদখল করা হয়েছে। সেখানে ইসরাঈল নামে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা দলে দলে এসে এখানে বাসস্থান গড়ে তুলছে। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স তাকে একটি বিরাট সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছে। ইহুদী পুঁজিপতিদের সহায়তায় ইহুদী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিগণ তাকে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। চারপাশের মুসলিম দেশগুলোর জন্য তাদের এ শক্তি এক মহাবিপদে পরিণত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ তাদের এই "উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশ" দখল করার আকাংখাটি মোটেই ঢেকে ছেপে রাখেনি। দীর্ঘকাল থেকে ভবিষ্যত ইহুদী রাষ্ট্রের যে নীল নক্শা তারা প্রকাশ করে আসছে পরের পাতায় তার একটি প্রতিকৃতি দেয়া হলো। এ নক্শায় দেখা যাবে, সিরিয়া, লেবানন ও জর্দানের সমগ্র এলাকা এবং প্রায় সমগ্র ইরাক ছাড়াও তুরস্কের ইস্কান্দারুন, মিসরের সিনাই ও ব–দ্বীপ এলাকা এবং মদীনা মুনাওয়ারাসহ আরবের অন্তরগত হিজায ও নজ্দের উচ্চভূমি পর্যন্ত তারা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আগামীতে কোন একটি বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তারা ঐসব এলাকা দখল করার চেষ্টা করবে এবং ঐ সময়ই কথিত প্রধানতম দাজ্জাল তাদের প্রতিশ্রুত মসীহরূপে আগমন করবে। রসূলুল্লাহ (সা) কেবল তার আগমন সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এই সংগে একথাও বলেছেন যে, সে সময় মুসলমানদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে এবং এক একটি দিন তাদের নিকট এক একটি বছর মনে হবে। এ জন্য তিনি নিজে মসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও আশ্রয় চাইতে বলেছেন।
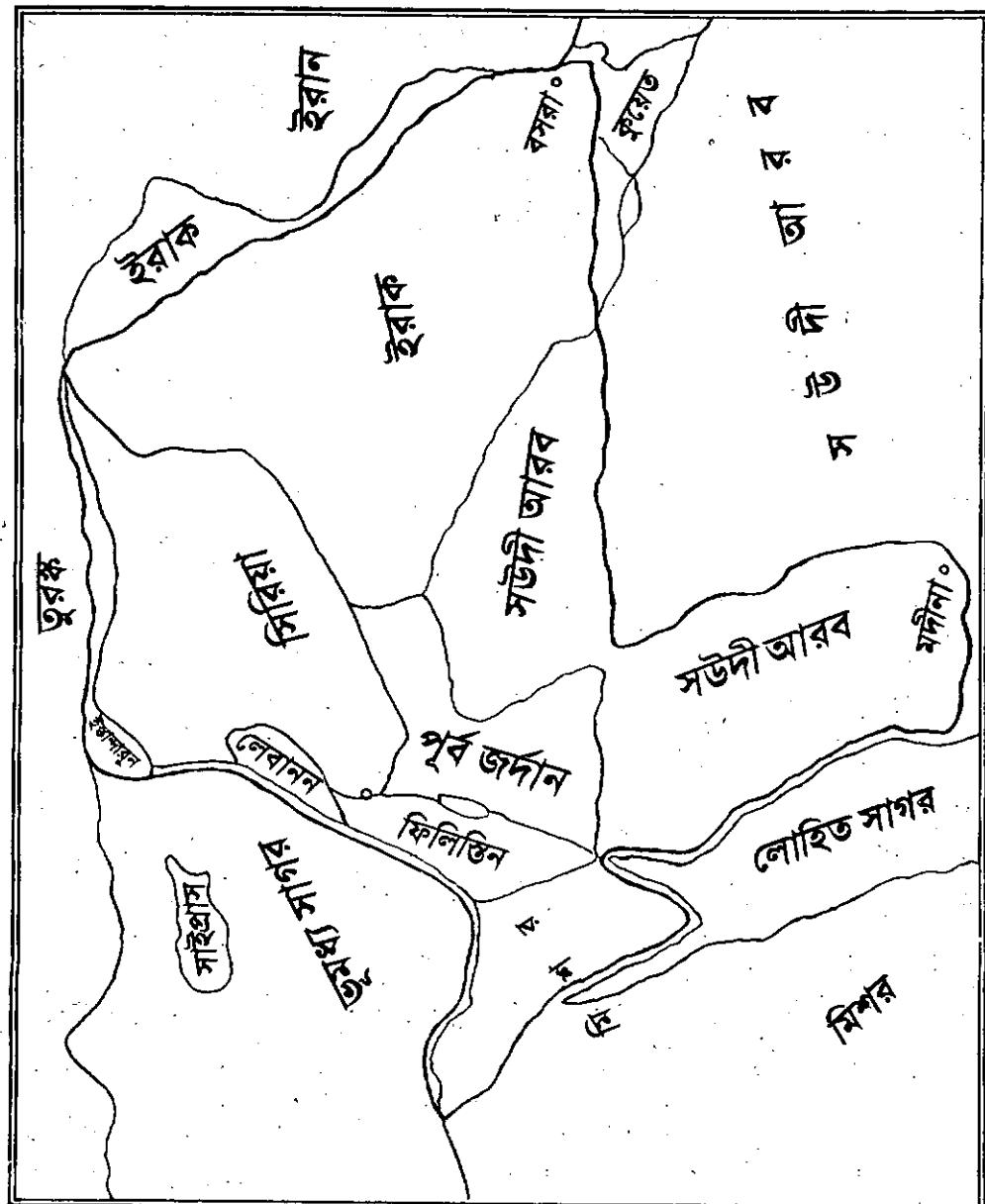
ইসরাঈলী নেতৃবৃন্দ যে ইয়াহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে
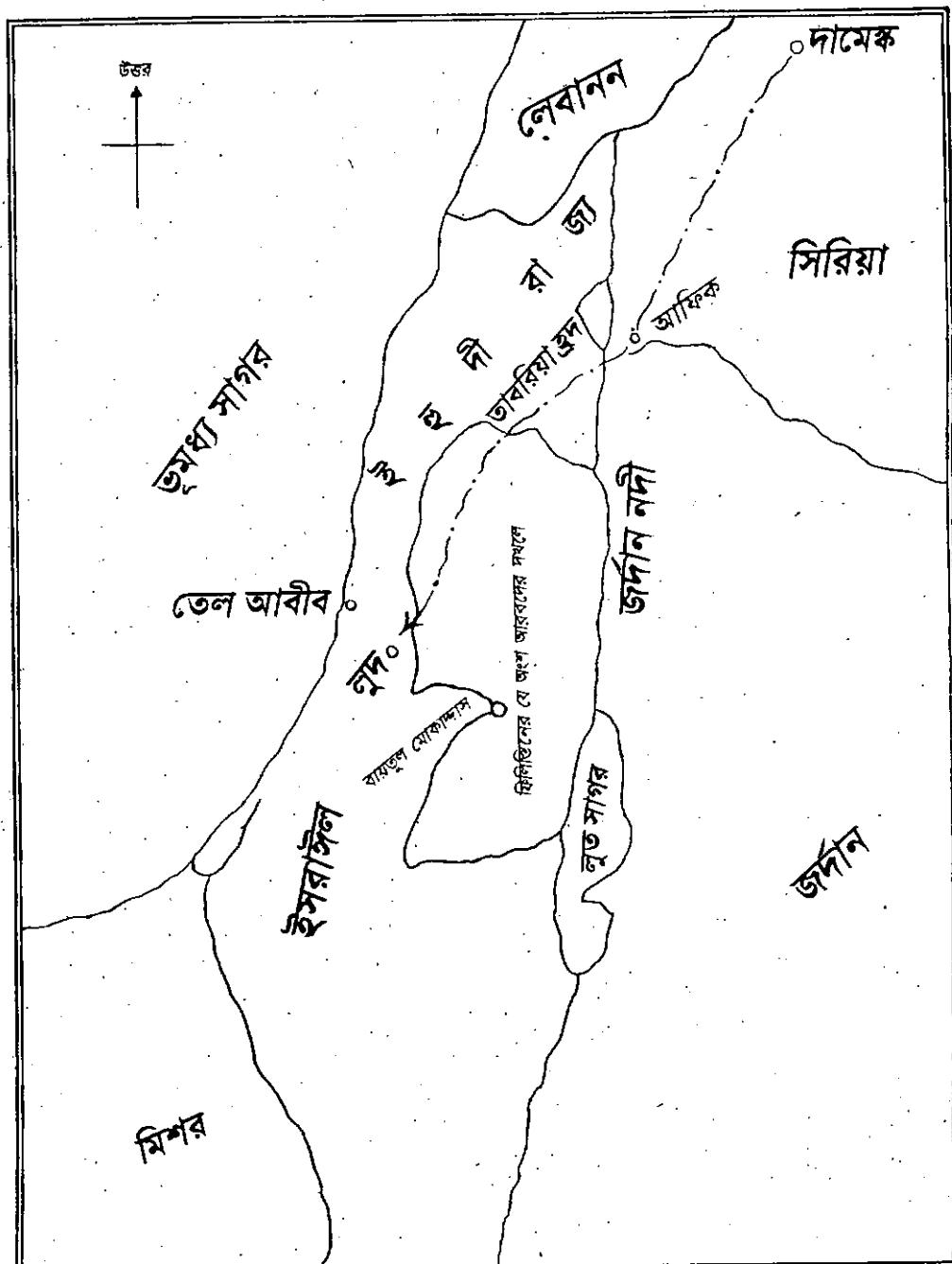
প্রকৃত মসীহ–এর অবতীর্ণ হওয়ার স্থান

এই মসীহ দাজ্জালের মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহ কোন 'মসীলে মসীহ'কে পাঠাবেন না বরং আসল মসীহকে পাঠাবেন। দু'হাজার বছর আগে ইহুদীরা এই আসল মসীহকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের জানা মতে তারা তাঁকে শূলবিদ্ধ করে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই আসল মসীহ ভারত, আফ্রিকা বা আমেরিকায় অবতরণ করবেন না বরং তিনি অবতরণ করবেন দামেশ্‌কে। কারণ তখন সেখানেই যুদ্ধ চলতে থাকবে। মেহেরবানী করে পরের পাতার নকশাটিও দেখুন। এতে দেখা যাচ্ছে, ইসরাঈলের সীমান্ত থেকে দামেশ্‌ক মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ইতিপূর্বে আমি যে হাদীস উল্লেখ করে এসেছি, তার বিষয়বস্তু মনে থাকলে সহজেই একথা বোধগম্য হবে যে, মসীহ দাজ্জাল ৭০ হাজার ইহুদী সেনাদল নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে এবং দামেশ্‌কের সামনে উপস্থিত হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে দামেশ্‌কের পূর্ব অংশের একটি সাদা মিনারের নিকট সুবৃহে সাদেকের পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং ফজর নামায শেষে মুসলমানদেরকে নিয়ে দাজ্জালের মুকাবিলায় বের হবেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে দাজ্জাল পশ্চাদপসরণ করে আফিয়েকের পার্বত্য পথ দিয়ে (২১ নম্বর হাদীসে দেখুন) ইসরাঈলের দিকে ফিরে যাবে। কিন্তু তিনি তার পশ্চাদ্ধাবন করতেই থাকবেন। অবশেষে লিড্ডা বিমান বন্দরে সে তাঁর হাতে মারা পড়বে (১০, ১৪ ও ১৫নং হাদীস)। এরপর ইহুদীদেরকে সব জায়গা থেকে ধরে ধরে হত্যা করা হবে এবং ইহুদী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে (৯, ১৫ ও ৩১ নম্বর হাদীস)। হযরত ঈসার (আ) পক্ষ থেকে সত্য প্রকাশের পর ঈসায়ী ধর্মও বিলুপ্ত হয়ে যাবে (১, ২, ৪ ও ৬ নম্বর হাদীস) এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সমস্ত মিল্লাত একীভূত হয়ে যাবে (৬ ও ১৫ নম্বর হাদীস)।

কোন প্রকার জড়তা ও অস্পষ্টতা ছাড়াই এই দ্ব্যর্থহীন সত্যটিই হাদীস থেকে ফুটে উঠেছে। এই সুদীর্ঘ আলোচনার পর এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, "প্রতিশ্রুত মসীহ''র নামে আমাদের দেশে যে কারবার চালানো হচ্ছে তা একটি প্রকাণ্ড জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ জালিয়াতির সবচাইতে হাস্যকর দিকটি এবার আমি উপস্থাপিত করতে চাই। যে ব্যক্তি নিজেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত মসীহ বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি নিজে ঈসা ইবনে মারয়াম হবার জন্য নিম্নোক্ত রসালো বক্তব্যটি পেশ করেছেন ঃ

> "তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় অংশে আমার নাম রেখেছেন মার্‌য়াম। অতপর যেমন বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, দু'বছর পর্যন্ত আমি মার্‌য়ামের গুণাবলী সহকারে লালিত হই.......অতপর.......মারয়ামের ন্যায় ঈসার রূহ আমার মধ্যে ফুঁৎকারে প্রবেশ করানো এবং রূপকার্থে আমাকে গর্ভবতী করা হয়। অবশেষে কয়েকমাস পরে, যা দশ মাসের চাইতে বেশী হবে না, সেই এলহামের মাধ্যমে, যা বারাহীনে আহমদীয়ার চতুর্থ অংশে উল্লেখিত হয়েছে, আমাকে মার্‌য়াম থেকে ঈসায় পরিণত করা হয়েছে। কাজেই এভাবে আমি হলাম ঈসা ইবনে মারয়াম।" (কিশতীয়ে নূহ ৮৭, ৮৮, ৮৯ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ প্রথমে তিনি মার্‌য়াম হন অতপর নিজে নিজেই গর্ভবর্তী হন। তারপর নিজের পেট থেকে নিজেই ঈসা ইবনে মার্‌য়াম রূপে জন্ম নেন। এরপরও সমস্যা দেখা দিল যে,

হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারয়াম দামেশ্‌কে অবতরণ করবেন। দামেশ্‌ক কয়েক হাজার বছর থেকে সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পরিচিত শহর। পৃথিবীর মানচিত্রে আজও এই শহরটি এই নামেই চিহ্নিত। কাজেই অন্য একটি রসাত্মক বক্তব্যের মাধ্যমে এ সমস্যাটির সমাধান দেয়া হয়েছে ঃ

> "উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দামেশ্‌ক শব্দের অর্থ আমার নিকট এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ স্থানে এমন একটি শহরের নাম দামেশ্‌ক রাখা হয়েছে যেখানে এজিদের সভাব সম্পন্ন ও অপবিত্র এজিদের অভ্যাস ও চিন্তার অনুসারী লোকদের বাস। ....এই কাদীয়ান শহরটি এখানকার অধিকাংশ এজিদী স্বভাব সম্পন্ন লোকের অধিবাসের কারণে দামেশকের সাথে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক রাখে।" (এযালায়ে আওহাম, ফুটনোট ঃ ৬৩ থেকে ৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)।

আর একটি জটিলতা এখনো রয়ে গেছে। হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ইবনে মারয়াম একটি সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। এ সমস্যার সমাধান সহজেই করে ফেলা হয়েছে অর্থাৎ মসীহ সাহেব নিজেই এসে নিজের মিনারটি তৈরি করে নিয়েছেন। এখন বলুন, কে তাঁকে বুঝাতে যাবে যে, হাদীসের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় ইবনে মারয়ামের অবতরণের পূর্বে মিনারটি সেখানে মওজুদ থাকবে। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহ সাহেবের আগমনের পর মিনারটি তৈরি হচ্ছে।

সর্বশেষ ও সবচাইতে জটিল সমস্যাটি এখনো রয়ে গেছে। অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনা মতে ঈসা ইবনে মারয়াম (আ) লিড্ডার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রথমে আবোলতাবোল অনেক কথাই বলা হয়েছে। কখনো স্বীকার করা হয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি গ্রামের নাম লিড্ডা (এযালায়ে আওহাম, আঞ্জুমানে আহমদীয়া, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত, ক্ষুদ্রাকার, ২২০ পৃষ্ঠা)। আবার কখনো বলা হয়েছে, "লিড্ডা এমন সব লোককে বলা হয় যারা অনর্থক ঝগড়া করে।.........যখন দাজ্জালের অনর্থক ঝগড়া চরমে পৌঁছে যাবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব হবে এবং তার সমস্ত ঝগড়া শেষ করে দেবে" (এযালায়ে আওহাম, ৭৩০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এত করেও যখন সমস্যার সমাধান হলো না তখন পরিষ্কার বলে দেয়া হলো যে, লিড্ডা (আরবীতে লুদ) অর্থ হচ্ছে পাঞ্জাবের লুদিয়ানা শহর। আর লুদিয়ানার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করার অর্থ হচ্ছে, দুষ্টদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মীর্জা গোলাম আহমদ সাহেবের হাতে এখানেই সর্বপ্রথম বাইয়াত হয়। (আলহুদা, ৯১ পৃষ্ঠা)।

যে কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এসব বক্তব্য বর্ণনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হবেন যে, এখানে প্রকাশ্য দিবালোকে মিথ্যুক ও বহুরূপীর অভিনয় করা হয়েছে।